আগষ্ট '৮৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

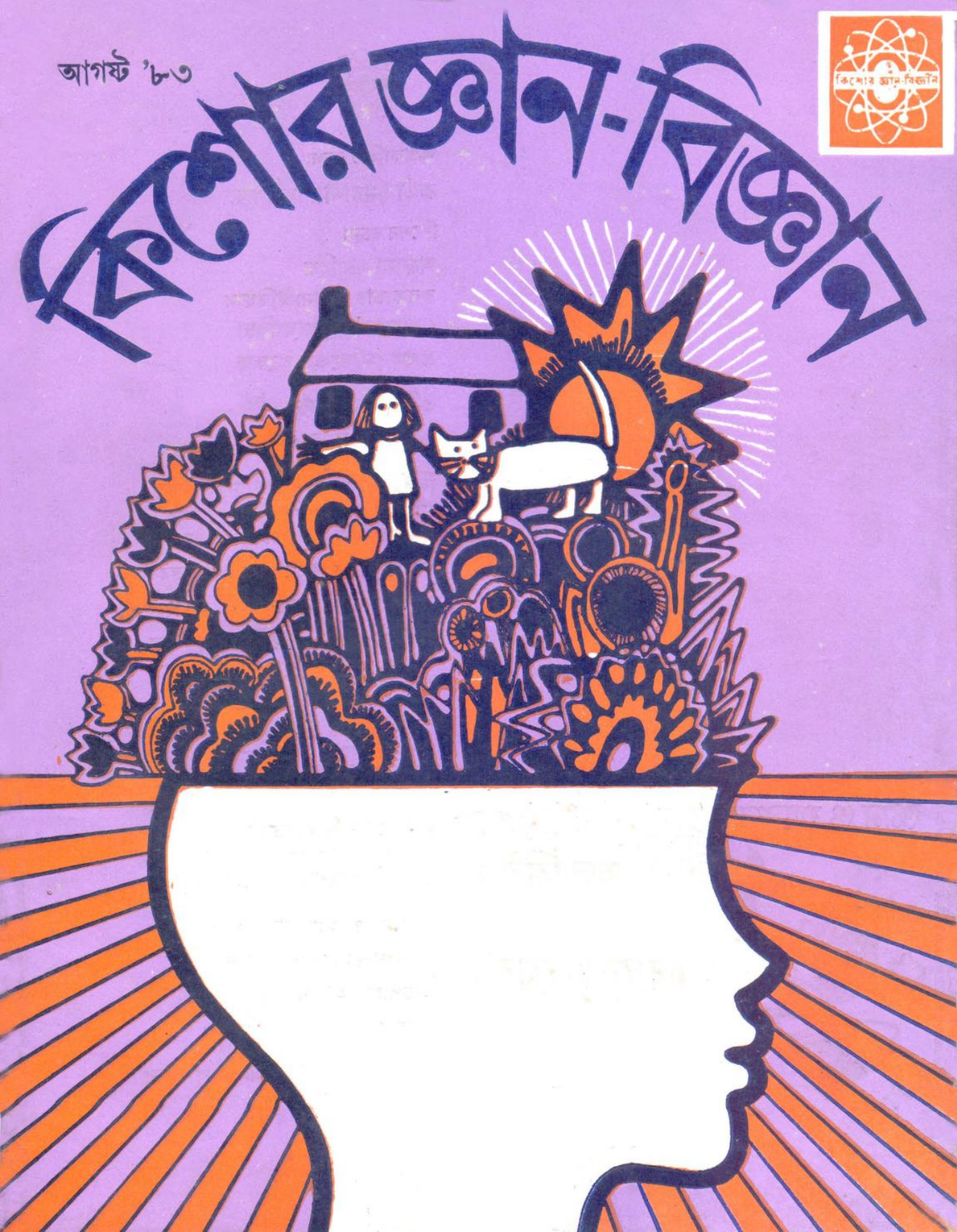

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

এবারেও সেরা

১৯৮৩

অপ্রকাশিত রচনা

কৃতী বিজ্ঞানীর চিঠিপত্র

বিশেষ রচনা

অজানা মহাবিশ্ব

কলকাতার অজানা ইতিহাস

কোম্পানীর বাগ্‌বাগিচা

প্রথম মেডিকেল কলেজ

৩টি বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস

৩টি সায়েন্স ফ্যাণ্টাসী

নির্বাচিত প্রবন্ধ : সমুদ্রের বিস্ময়

সমুদ্রের বিচিত্র গাছপালা, প্রাণীজগৎ আবহাওয়া ও পরিবেশ এবং সমুদ্রের সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে ৬টি প্রবন্ধ।

১২টি বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

৩টি বিশ্বখ্যাত রচনার অনুবাদ

কল্পবিজ্ঞানের ছড়া, ধাঁধা

ভেলকি ও হেঁয়ালি

৪টি রঙ্গীন চিত্রকাহিনী

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রবন্ধ

প্রাচীন ও আধুনিক পৃথিবীর তাবৎ খবরাখবর সহ পশুপাখী গাছপালা, আবিষ্কা রও গবেষণা নিয়ে লেখা ২০টি সরস প্রবন্ধ।

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ও পুরস্কার

বিনামূল্যে বহুরঙে ছাপা ঝলমলে থট রিডিং কার্ড।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 4র্থ সংখ্যা ॥ আগস্ট, 1983

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর

সম্পাদক ঃ রবীন বল

দোসরা আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম দিনটিকে প্রতি বছর 'বিজ্ঞান দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সারা জীবন বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান প্রসার ও বৈজ্ঞানিক শিল্প উন্নয়নে উৎসর্গ করেছিল, এমন কি তাঁর স্বোপার্জিত সমুদয় অর্থও বিজ্ঞান গবেষণার জন্যে দান করে গেছেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে অনুব্রতী হয়ে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার না ঘটলে এবং তারা বিজ্ঞান সচেতন না হয়ে উঠলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সাধিত হতে পারে না। তোমরা যদি সেইভাবে নিজেদের জীবন গড়ে তোলো, তা হলেই সার্থক হবে তাঁর প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধানিবেদন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে
নক্ষত্র কি নক্ষত্রকে আত্মসাৎ করে ?
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 3
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
ব্রেন কণ্ট্রোল ॥ সুকুমার ভট্টাচার্য 23
পড়াশোনা
সমীকরণ সমাধানের সহজ পদ্ধতি ॥ নন্দলাল মাইতি 29
বহুরূপী মৌল ॥ অমরনাথ রায় 21
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ (15) ॥ তারকমোহন দাস 45
বিশ্বাস যুক্তি-বিজ্ঞান
জ্বর কোন রোগ নয় ॥ সুনির্মল রায় 15
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 17
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 18, 19
দুঃস্বপ্ন ॥ উজ্জ্বল ধর 28
জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার ঃ 54, 55
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ॥ ধীরেন বল 56
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 12
পশু পাখি উদ্ভিদ
বন বিড়াল ॥ ধীরেন দত্ত 42
গণ্ডার ॥ ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল 41
একটি শৌখিন চিরহরিৎ বৃক্ষ ॥ নির্মাল্য চক্রবর্তী 11
ছড়া
বাতাসের কারসাজি ॥ উৎপল চৌধুরী 44
উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপ্‌লস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 5
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 33
জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
বিজ্ঞান ও কবিতা ॥ শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় 9
প্রাণীজ সৌরভ ॥ সুনীত রায় 13
ভাবনা ॥ অনির্বাণ চক্রবর্তী 22
8-এর মজা ॥ সজল চক্রবর্তী 36
আকাশে তারাদের গতিপথ ॥ বিমান বসু 37
দাবানল ॥ প্রবীরকুমার পাল 40
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ ॥ বরুণ মজুমদার 20
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা ॥ বিবেক রায় 31
আবিষ্কারের কাহিনী
দমকল আবিষ্কারের কাহিনী ॥ নির্মলকান্তি ঘোষ 8
নিজে কর
স্বয়ং সঙ্কেতজ্ঞাপক চিঠির বাক্স ॥ বিশ্বজিৎ দত্ত 53
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 47
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা 50
প্রশ্নোত্তর 48
লাঙ্-ফিশ ॥ বিপ্লব সরকার 48
গাছের মূল্য ॥ (1) সোনালী মণ্ডল 49, (2) সুজয় দত্ত, (3) মৃগাঙ্কমৌলি দেব 51, 52
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 50
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 50
শব্দকূট ॥ অমিতাভ সোম 49
শব্দকূটের উত্তর 49

সহ-সম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছবি এঁকেছেন ঃ অলয় ঘোষ, বিদ্যা শোক

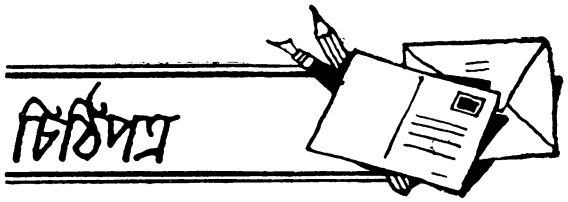

প্রসঙ্গ : ঘনাদা ক্লাব

3. জুলাই সংখ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষের ঘনাদা ক্লাব গড়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানাই। তিনি বলেছেন, এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হবে—ঘনাদার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যানুসন্ধান, ঘনাদার বংশপঞ্জী রচনা, ঘনাদার বিশ্ব ও মহাবিশ্ব ভ্রমণের মানচিত্র তৈরী করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন আগ্রহী সদস্য হিসেবে আমার মনে হয়েছে, এইসব অনুসন্ধানপর্বের পূর্বে ঘনাদা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হওয়া দরকার। একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবে আমি নিবেদন করছি যে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি গল্প ও 2/1টি বই ছাড়া আমার বিশেষ কিছুই পড়া নেই। অথচ কিছুকাল আগেও বিজ্ঞাপন মারফৎ জানতে পেরেছি ঘনাদার সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ হয়ে গেছে। দীর্ঘ 50 বছরেরও আগে যে অঘটন-ঘটনপটিয়সী ঘনাদার সাময়িক পত্রিকার পাতায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর কীর্তিকাহিনী লেখা গল্পের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আমার অনুরোধ ঘনাদার যাবতীয় রচনার একটি বিস্তৃত তালিকা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করুন। তা হলে প্রস্তাবিত ঘনাদা ক্লাবের প্রতিটি আগ্রহী সদস্যই এতে উপকৃত হবেন।

অশোক মিত্র, এলাহাবাদ।

4. প্রস্তাবিত ঘনাদা ক্লাবের আমি সদস্য হতে আগ্রহী। আমার মতে ঘনাদার মুখ-নিঃসৃত কোনো কাহিনী থেকেই একটি প্রতীক খুঁজে নেওয়া যেতে পারে—যেমন মশা, মাছি বা সেই বিচিত্র পোকা—সিস্টোসার্কা গ্রিগোরিয়া।

বিকাশ দত্ত, কলি-9

5. আমি ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে ইচ্ছুক। এর সদস্য চাঁদা কত জানতে পারলে খুশী হব। আমার মতে ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক হওয়া উচিত কোন বুদ্ধিমান বিরল প্রাণী।

দীপান্বিতা বসু, কলি-26

6. আমি ঘনাদা ক্লাবের সদস্য হতে আগ্রহী। প্রতীক চিহ্ন—বৃত্তের মাঝে উদীয়মান সূর্য। —শিবনাথ খাঁ, হুগলী

7. আমি ঘনাদা ভক্ত। তাই ঘনাদা ক্লাবের সভ্য হতে চাই। সম্ভাব্য প্রতীক—প্রদীপের দীপশিখা।

সৌমিত্র মজুমদার, 24 পরগনা

প্রসঙ্গ : বৈদ্যুতিক মডেল

গত এপ্রিল '83 সংখ্যায় প্রকাশিত দেশকল্যাণ চৌধুরীর লেখা 'একটি বৈদ্যুতিক মডেল' অনুযায়ী জলতল বাড়াকমা সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখলাম। কিন্তু অভীষ্ট ফল পেলাম না। আমার মনে হয়, শুধু জলের পরিবর্তে জলে সালফিউরিক অ্যাসিড মেশালে কাজ হবে।

সুব্রত চৌধুরী, 16/27, শিবাজী রোড, -দুর্গাপুর4

—তোমার বক্তব্যই ঠিক। কারণ বিশুদ্ধ জল বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়।

প্রসঙ্গ : সবুজ বনের গান

গত মে '83 সংখ্যা থেকে প্রকাশিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসটি আগ্রহ সহকারে পড়ছি এবং পড়ে আনন্দ পাচ্ছি। তবে আমার একটা বক্তব্য আছে। কাপ্তেন টমাস কুকের লগবুক থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে উনি লিখেছেন, 'কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ভারত মহাসাগরে। অক্ষাংশ 20 ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ 80 ডিগ্রি।' কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে লক্ষ্য করলাম, উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অবস্থানের অক্ষাংশ 20 ডিগ্রির চেয়েও অনেক কম এবং দ্রাঘিমাংশও প্রায় 100 ডিগ্রির কাছাকাছি। যদিও এটি নিছক গল্পমাত্র এবং তাতে তথ্যের কিঞ্চিৎ হেরফের সমর্থিত, তবুও কাহিনীর পটভূমিকা যখন বাস্তবতা থেকেই গৃহীত এবং লেখাটি পরিবেশিত হচ্ছে সম্পূর্ণ বাস্তবের ঢঙে, তখন সঠিক তথ্য বিবৃত করা হলেই উপকৃত হতাম।

দেবাশিষ কর, ঠাকুরবাটি স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী

প্রসঙ্গ : নিজে কর

'নিজে কর' বিভাগে যেসব মডেল তৈরী করা শেখানো হয় তা অনেক সময় জটিল এবং ব্যয়সাধ্য। এর ফলে আমাদের মতো সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে মডেল তৈরী করা দুরূহ হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মৃত্যুঞ্জয় পাল, অমরারগড়, বর্ধমান

প্রসঙ্গ : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

জুন '83 সংখ্যায় কৃতী বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন প্রসঙ্গে বিবেক রায় লিখেছেন—'তাঁকে কার্বনের একটি আইসোটোপ C-14 উপহার দিলেন।' কিন্তু অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে আমরা দেখেছি কার্বনের আইসোটোপগুলি C^{12}, C^{14} এইভাবে লেখা আছে।

তোমার বক্তব্যই ঠিক, C^{14} হবে।

প্রসঙ্গ : ছায়ামূর্তি

জুন '83 সংখ্যা 'ছায়ামূর্তি' গল্পের লেখকের নাম ভুলক্রমে আশীষব্রত ঘোষ ছাপা হয়েছে। হবে অনীশব্রত ঘোষ, 265A, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলকাতা-36

নক্ষত্র কি নক্ষত্রকে আত্মসাৎ করে ?

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি নক্ষত্র অপর একটি নক্ষত্রকে আত্মসাৎ করছে—এমন কথা শুনলে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হয় না ? আমরা তো জানি, মহাসমুদ্রে বড় মাছেরা অপেক্ষাকৃত ছোট মাছদের উদরসাৎ করে থাকে। এক সময় মানুষদেরও মধ্যে এমন এক শ্রেণী ছিল, যারা মানুষের মাংস খেত। কিন্তু নক্ষত্ররাও স্বগোত্রীয়দের আত্মসাৎ করে এমন কথা কি আমরা কখনও শুনেছি ! অবশ্য আমরা পুরাণে শুনেছি, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় রাহু তাদের গ্রাস করে। এটি নিছক পৌরাণিক কাহিনী, এর মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই।

তবে হ্যাঁ, তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন সম্ভাব্যতার কথা বেশ কয়েক বছর থেকে বলছেন। এবং সম্প্রতি এবিষয়ে কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণও পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আরকানাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যালবার্ট গ্রাউয়ার এবং লুসিয়ানা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওয়ার্ড বণ্ড প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়েছেন যা থেকে বলা যায়, নক্ষত্ররা আক্ষরিক অর্থে সহযাত্রী অপর নক্ষত্রকে উদরসাৎ করতে পারে এবং তার ফলে মহাশূন্যে নাক্ষত্রিক বস্তুনিচয় উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাছাকাছি প্রদক্ষিণরত যুগল-নক্ষত্র বা জুড়ি-তারা সৃষ্টি করে।

কয়েক ঘণ্টা সময়ে পরস্পর প্রদক্ষিণরত এই নক্ষত্র-যুগল যে নীহারিকার কেন্দ্রে থাকে বলে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা থেকেই নক্ষত্রের স্বগোত্রীয়কে আত্মসাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য মিলেছে। আমাদের সৌরজগৎ থেকে বহু দূরবর্তী এই নীহারিকা হচ্ছে মহাজাগতিক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ, যার আকৃতি অনেকটা চক্রের মতো। ছোট দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখলে এই চক্রাকার নীহারিকাকে 'গ্রহ' বলে মনে হয়।

এই দুজন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চারটি দূরবীন দিয়ে সুদূরবর্তী এই নীহারিকার কেন্দ্রে বিরাজমান নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করেন। চারটি দূরবীনের মধ্যে দুটি ছিল 915 মিলিমিটার ব্যাসের। এই দুটি দূরবীনের মধ্যে একটি স্থাপিত অ্যারিজোনার কীট পর্বতশীর্ষে জাতীয় মানমন্দিরে এবং অপরটি স্থাপিত লুসিয়ানা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরে। আর দুটি দূরবীন স্থাপিত চিলিতে সেরো টোলোলো আন্তঃ-আমেরিকান মানমন্দিরে।

অধ্যাপক গ্রাউয়ার এবং অধ্যাপক বণ্ড তাঁদের পর্যবেক্ষণে বেশ কয়েকটি এই ধরনের 'কেন্দ্রীয় নক্ষত্র'-এর সন্ধান পেয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের নক্ষত্রকে একক নক্ষত্র বলেই ভাবা হত, যারা তাদের জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে মহাশূন্যে মহাজাগতিক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ উৎক্ষেপ করে। কিন্তু গ্রাউয়ার এবং বণ্ড দেখেছেন, এরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অতি কাছাকাছি পরস্পর প্রদক্ষিণরত নক্ষত্র-যুগলের দল। সাম্প্রতিকতম যে যুগল-নক্ষত্রটি তাঁরা সনাক্ত করেছেন, সেটি 'অ্যাবেল-41' নামে অভিহিত গ্রহসদৃশ নীহারিকার কেন্দ্রীয় নক্ষত্র। এই নক্ষত্র-যুগল ছায়াপথের দক্ষিণ তারামণ্ডল 'সারপেনস্ কাউডা'তে অবস্থিত এবং আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী থেকে আনুমানিক 6000 আলোকবর্ষ দূরবর্তী। এই দুটি নক্ষত্র পরস্পরের এত কাছাকাছি আছে যে 2 ঘণ্টা 43 মিনিটেরও কম সময়ে তারা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। গ্রাউয়ার এবং বণ্ড আরও তিনটি যুগল-নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন, যাদের পরস্পর প্রদক্ষিণ কাল হচ্ছে 11 থেকে 16 ঘণ্টার মধ্যে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় জানা গেছে, নক্ষত্রের গঠন-উপাদান প্রধানত হাইড্রোজেন গ্যাস। মহাকর্ষ ও আবর্তনের ফলে সংকুচিত হয়ে সেই গ্যাসরাশি জমাট বেঁধে আছে। নক্ষত্র-কেন্দ্রের প্রায় দু কোটি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সেখানকার হাইড্রোজেন তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে না, ভেঙে যায়। এই ভাঙনের নাম পারমাণবিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস রূপান্তরিত হয় হিলিয়াম গ্যাসে। এই রূপান্তরণকালে যে তেজ উৎপন্ন হয়ে সেই তেজই নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আংশিকভাবে বিকীর্ণ হয়। দু কোটি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিলিয়াম গ্যাসের আর কোনো পরিবর্তন হয় না। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন জ্বালানীর ছাই হচ্ছে হিলিয়াম।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরের হাইড্রোজেন যত হিলিয়ামে পরিণত হয় ততই তারা আকারে স্ফীত হয়ে ওঠে। শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ হাইড্রোজেন যদি হিলিয়ামে

রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা হলে নক্ষত্রের আকার প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, তার দেহের ঘনত্ব কমে এবং সেকারণে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে নক্ষত্রটি দেখতে লালবর্ণ হয়। নক্ষত্র তখন আকৃতিতে বিরাট এবং বর্ণে লাল, এজন্যে এদের বলা হয় 'লাল দানব'।

এই ধরনের নক্ষত্রের যদি প্রদক্ষিণকারী অপর একটি দোসর নক্ষত্র থাকে (যা তাদের অনেকেরই থাকে), সেক্ষেত্রে স্ফীতকায় লাল দানবটি তার দোসরকে গ্রাস করে ফেলে। অর্থাৎ কবলিত দোসর নক্ষত্রটি তখন লাল দানবের আবহাওয়ার মধ্যে বাঁধা পড়ে আস্তে আস্তে পাক খেতে থাকে। মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন পৃথিবীর আবহাওয়ার বহিঃস্তরে প্রবেশ করে তার প্রদক্ষিণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, অনেকটা সেরকমের ব্যাপার ঘটে কবলিত দোসর নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। লাল-দানবের আবহাওয়ার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আত্মসাৎ-করা দ্বিতীয় নক্ষত্রটি তার বহিঃস্তরের আবর্তন-গতি ক্রমশ বাড়িয়ে দেয়। এই গতি বাড়তে বাড়তে লাল দানবের বহিঃস্তরে যখন পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চিত হয়, তখন বহিঃস্তরের একেবারে বাইরের দিক থেকে অনেকখানি বস্তুপিণ্ড মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। পড়ে থাকে পরস্পরকে কাছাকাছি প্রদক্ষিণরত নক্ষত্র-যুগল এবং তাদের ঘিরে থাকে মহাজাগতিক মেঘপুঞ্জের নীহারিকা।

তত্ত্বীয় প্রকল্প অনুযায়ী নক্ষত্রের এই যে শেষ পরিণতির কথা বলা হয়, তার সঙ্গে গ্রাউয়ার এবং বণ্ড আবিষ্কৃত অ্যাবেল 41 নীহারিকার কার্যধারা সুন্দরভাবে মিলে যায়।

কয়েক বছর আগে আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বার্নার্ড বপ্ একশ্রেণীর হলদে—দানব নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন যারা তাদের প্রত্যাশিত গতির চেয়ে দ্রুততর গতিতে আবর্তন করে। লাল-দানবের তুলনায় এদের অভ্যন্তরের কম পরিমাণ হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয় হিলিয়ামে। হলদে-দানবের অপ্রত্যাশিত এই দ্রুত গতিতে আবর্তনের ঘটনাকে অধ্যাপক বপ্ তার দোসর নক্ষত্রকে আত্মসাৎ করার কারণ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকে আমরা তা হলে দেখতে পাচ্ছি, নক্ষত্রদের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একে অপরকে আত্মসাৎ করার ঘটনা নিছক অলীক কল্পনামাত্র নয়।

আগামী সংখ্যার 'দপ্তর থেকে' ঃ সমরজিৎ করের—পশ্চিম জার্মানীতে কয়েকদিন

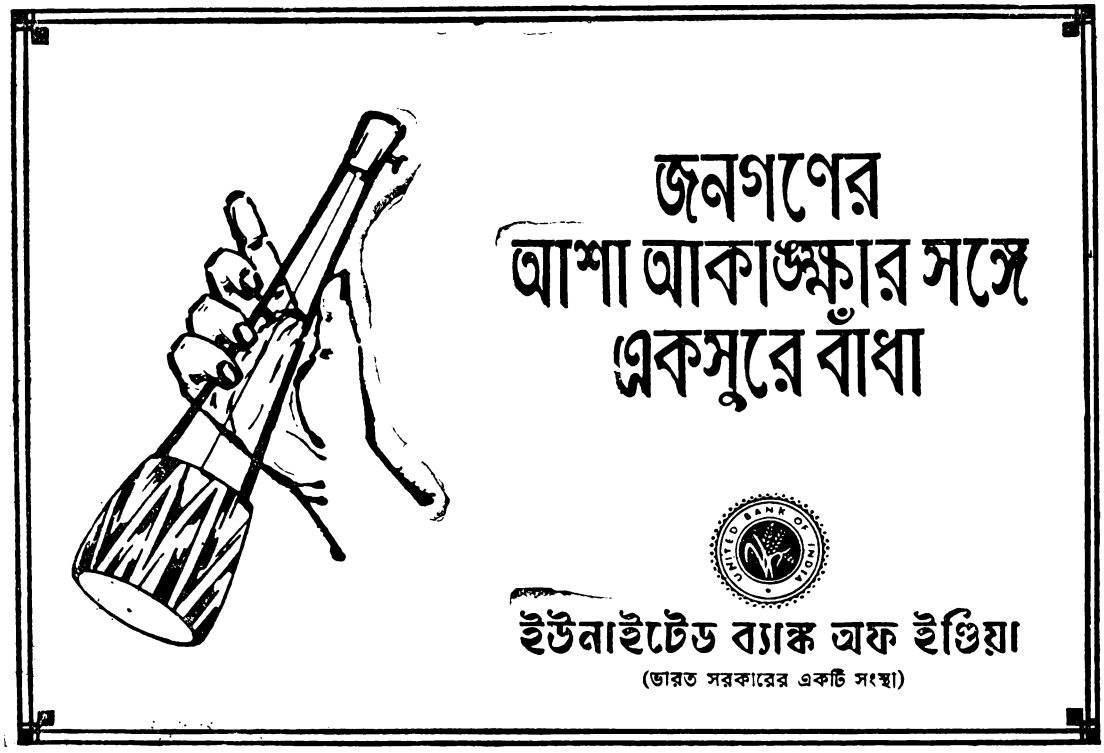

ধারাবাহিক উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

রহস্যময়ভাবে মফস্বল শহরের একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়ে গেল। যে ব্যাঙ্কে সদ্য ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে এসেছে সুশান্ত। কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে, ব্যাঙ্কের তালা না ভেঙে স্ট্রংরুম থেকে ডাকাতি হয়ে গেল বহু টাকা। স্ট্রংরুমের তালা খুলতে হলে তো দুটো চাবির প্রয়োজন হয়—যার একটা থাকে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের কাছে, আর একটা সুশান্তর নিজের কাছে। তা হ'লে ডাকাতেরা তালা খুলল কি করে? একটু পরেই এল পুলিশ। সকলের জবানবন্দী নেওয়া হল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও একজন ডিরেক্টর এলেন। ব্যাঙ্কের সব কর্মচারীই দোষ চাপাল সুশান্তর উপরে। সুশান্ত ভীষণ ভেঙে পড়ল। অবশেষে তার বাবার বন্ধু সতীনাথ বাবুকে কলকাতায় চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাল। সতীনাথ বাবু—ডিটেক্‌টিভই শুধু নন, বড় বৈজ্ঞানিক। ব্যাঙ্ক সুশান্তকে সাসপেণ্ড করল। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে এলেন নতুন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিঃ কে. সি. ত্রিবেদী।

সতীনাথবাবু হঠাৎই এসে সুশান্তকে যে জিনিস দেখালেন, তাতে সুশান্তর চিন্তা আরও বেড়ে গেছে। স্ট্রংরুমের আলমারীতে যে ছাপ পাওয়া গেছে, তা মানুষের হাতের ছাপ নয়—বানর জাতীয় কোন প্রাণীর!

সতীনাথ বাবু পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে তাঁকে ছোট্ট একটা জিনিসের ফিঙ্গার প্রিন্ট করে দিতে বললেন। ফিঙ্গার প্রিন্টটা কিছুটা নতুন খবর এনে দিয়েছে। কলকাতা থেকে সতীনাথ বাবু ফিরলেন পুলিশের এস পি এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর মিঃ সেনকে সঙ্গে নিয়ে। সুশান্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। এস পি জানালেন সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করেছে। তিনজন অপরাধীর মধ্যে একজন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, দ্বিতীয় থানার ছোটকর্তা, আর তৃতীয় নতুন ম্যানেজার মিঃ ত্রিবেদী! সরযূপ্রসাদই যে মিঃ ত্রিবেদী একথা শুনে সুশান্ত বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় এবং চমৎকৃত হয়ে পড়ে ব্যাঙ্ক ডাকাতির দুর্ধর্ষ পরিকল্পনা শুনে।

আঠারো

"তুমি তো ভালো ছাত্র ছিলে, মেধাবী বলে কলেজ তোমার নাম ছিল। মনো-বিজ্ঞান নিয়ে কখনও পড়াশোনা করেছ কি?"—সতীনাথ বাবু প্রশ্ন করলেন।

"না, তে-তেমন করে কিছু পড়ি নি!"—আমতা আমতা করে জবাব দিলে সুশান্ত।

"পড়া উচিত ছিল। ওটা একটা আধুনিক বিজ্ঞান। ও সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই থাকা উচিত। তা ছাড়া তুমি এই প্রথম বাইরে চাকরি করতে এসেছিলে, অভিজ্ঞতা যাকে বলে তা তোমার—নীল্। লোকচরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু সাবধান হওয়া দরকার তা তুমি জানতেও না, কেউ বলেও দেয় নি। নইলে এত শীগগির তুমি সরযূপ্রসাদের জালে জড়িয়ে পড়তে না। এত লোক থাকতে সরযূপ্রসাদের সম্বন্ধে আমার এত কৌতূহল কেন জানতে চাইছ? কৌতূহল হওয়াই তো স্বাভাবিক। এখন বলতে বাধা নেই, এখানে এসেই আমি প্রথমে তোমার হালচাল সম্বন্ধেও একটু খোঁজখবর নিয়েছিলাম। ও আমাদের নিতে হয়। আর তখনই জানতে পারলাম—এখানে তোমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল সরযূপ্রসাদ। দারুন মাখামাখি ছিল তোমার সঙ্গে। নতুন জায়গায় এসেছ নতুন আলাপ, এত অল্প দিনে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়েছিল কি? তাই স্বভাবতঃই আমাকে সরযূপ্রসাদ সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলেছিল। ভুল যে করি নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।"

"কিন্তু ও যে রকম অমায়িক, যে রকম নিজে থেকে এসে আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাতে কি আমার পক্ষে ওকে এড়িয়ে চলা ঠিক হত? নতুন জায়গায় ও রকম একটি লোককে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমার তো মনে হয়েছিল আমি পরম ভাগ্যবান। কিন্তু ওর মধ্যে যে অমন একটা শয়তান লুকিয়ে থাকতে পারে তা কি করে কল্পনা করব?"

"ওরা নিজে থেকে এসে আলাপ করার মধ্যে হয়তো কোন বদ্ মতলব ভাবতে পার নি, কিন্তু ও যেভাবে একটু একটু করে তোমার সমস্ত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছিল তাতে ওর সম্বন্ধে তোমার আর একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল বলে আমার মনে হয়। হাজার হোক, তুমি এখানে একটা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে এসেছ, লোকচরিত্র সম্বন্ধে উদাসীন হলে চলে কি?"

"কিন্তু—"

"হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমি পরিণত বয়সের নানান্ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাপারটা যে চোখে দেখছি, তোমার অপরিণত বয়সের অনভিজ্ঞতা সেটা বিচার করার কথা

ভাবো নি। তা ছাড়া, তুমি এমনিতেই যাকে বলে ভালো মানুষ, সবাইকেই নিজের মত মনে কর। কিন্তু দুনিয়াটা তো ঠিক তা নয় বাবা, এখানে পদে পদে সাবধান না হলে বিপদের সম্ভাবনা। যাক্ গে, এখন তো ও-সব ভেবে লাভ নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ কিভাবে আমি ধীরে ধীরে এগিয়েছি সেইটে নিয়েই আলোচনা করা যাক। এর মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য যেমন নিতে হয়েছে, ন্যায়শাস্ত্রের -যাকে আমরা বলি লজিক,—তার সাহায্যও নিতে হয়েছে। কারণ ওদের একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা এগোতে পারে না। লজিকের বই যদি খোল গোড়াতেই দেখবে লেখা আছে "লজিক ইজ্ দি সায়ন্স অব্ অল্ সায়ান্সেস অ্যাণ্ড আর্ট অব্ অল আর্ট্স্।" কথাটা একেবারে সত্যি।

"যেমন ধর, সেরাত্রে যখন ব্যাঙ্ক ডাকাতি হ'ল ভোর বেলাই গিয়ে তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে। তদন্তের জন্যে পুলিশের বড় কর্তা ছোট কর্তা দু'জনই এসেছিলেন। নিয়মমত তালার গায়ে, দরজার হাতলে বা আলমারির পাল্লায় বা দেয়ালে কারও আঙুলের ছাপ আছে কিনা দেখবার জন্যে পাউডার ছড়িয়ে ফ্ল্যাশ্ লাইট ফেলে তার ফটোও নেওয়া হয়েছিল। তারপর সেই আঙুলের ছাপের ছবি যখন পাওয়া গেল—আমরা তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। কারণ ও আঙ্গুল কোন মানুষের নয়, শিম্পাঞ্জী বা কোন বড়সড় বানর জাতীয় জীবের। ডাকাতরা কি তা হলে কোন পোষা শিম্পাঞ্জী বা বড় জাতের বানরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল আর তাকে দিয়েই তালা খুলিয়েছিল?

শিক্ষিত শিম্পাঞ্জীকে দিয়ে এসব কাজ করানো অসম্ভব নয়, কিন্তু এই মফঃস্বল শহরে শিম্পাঞ্জী নিয়ে আসা যেন একটু কেমন কেমন লাগে! নদীর ওপারে যে বিরাট শাল-মহুয়ার বন আছে সেখানে কিছু বড় বড় বাঁদর থাকে বলে শুনেছি। তবে কি তাদেরই কোনটাকে ধরে এনে, ট্রেনিং দিয়ে, এ কাজ করানো হয়েছে?

"কিন্তু একটা কথা, স্টুংরুমের মেঝেতে ধুলোর মধ্যে যে সব দাগ রয়েছে তা সবই জুতোর দাগ। খালি পায়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি সেখানে। না মানুষের, না বাঁদরের। তা হলে কি বলব ঐ শিম্পাঞ্জী বা বাঁদরকেও ওরা জুতো পরিয়ে এনেছিল? সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না, কোলে করেও নিশ্চয়ই আনে নি। তা হলে? তা হলে একটাই ধারণা হয়, ওগুলো সত্যিই বাঁদরের বা শিম্পাঞ্জীর আঙুলের ছাপ কিনা।

এইখানে আমার প্রাণিবিজ্ঞান অর্থাৎ জুওলজির যেটুকু জ্ঞান তা খাটাতে হ'ল। আমি ঐ আঙুলের ছাপের সঙ্গে বিভিন্ন জাতের বাঁদরের ও বনমানুষের আঙুলের গড়ন মিলিয়ে দেখলাম। না, ঠিক ঠিক কোনটার সঙ্গেই ওর মিল নেই। বুড়ো আঙুলগুলো দেখতে বাঁদরের মতই বটে, কিন্তু তার চাইতেও বেশ একটু বেশি লম্বা মনে হ'ল। তবু স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্যে আমি চলে এলাম ইউনিভার্সিটির জুওলজি ডিপার্টমেণ্টে। সেখানে আমার একটি সহপাঠী বন্ধু ডক্টর রমেশ মালহোত্রা নামকরা অধ্যাপক, আর তাঁর গবেষণার বিষয় হচ্ছে প্রাইমেটিস। জান বোধ হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এই প্রাইমেটিস—সংক্ষেপে প্রাইমেট্রাই হচ্ছে সব চেয়ে উন্নত ধরনের প্রাণী, একেবারে শেষের ধাপের প্রাণীও বলা যেতে পারে এদেরকে। আমরা, মানুষরা এই প্রাইমেট্দের মধ্যেই পড়ি। মানুষ ছাড়া আরও তিন রকম প্রাইমেট আছে। এক—লেমুর, দুই—বানর, আর তিন—এপ্, যাদের বাংলায় বলা হয় অর্থাৎ বনমানুষ। এই বনমানুষও আবার তিন জাতের—শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটান আর গেরিলা। এরাই মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি।

"ডক্টর মালহোত্রাও আঙুলের ছাপগুলি দেখে আমার সঙ্গে—একমত হলেন—ওগুলো এই এপ্ বা বনমানুষের আঙুলের মত মনে হ'লেও তাদের কোনটার সঙ্গেই এর হুবহু মিল নেই। এ ছাড়া এত বড়—এত লম্বা আঙুল অন্য কোন বানর জাতীয় জীবের মধ্যে দেখা যায় না। ঐ সময় ঘটনাচক্রে জুওলজিক্যাল সার্ভের একজন পদস্থ প্রাণিবিজ্ঞানীও ডক্টর মালহোত্রার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনিও ঐ একই মন্তব্য করলেন। ওগুলো বনমানুষের আঙুলের ছাপের মত দেখতে হলেও বনমানুষের নয় কখনই। মালহোত্রার সঙ্গে এ বিষয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি আলোচনাও হ'ল। সেগুলো একেবারে খাঁটি জুওলজির ভাষা। আমি তো আর ওদের মত জাতবিজ্ঞানী নই, তাই কিছু কিছু বুঝলেও সবটা বুঝি নি। তাই তোমাকেও বোঝানোর চেষ্টা করব না। তবে ওঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বোঝা গেল—ওটা নকল বাঁদুরে আঙুলের ছাপ—অর্থাৎ ও আঙুল কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়েছে।

"কিন্তু কেন? এর উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয় বোধ হয়। ঐ রকম নকল আঙুলওয়ালা দস্তানা পরে নিয়ে সে হাত দিয়ে কোন কিছু ধরলে তখন ঐ দস্তানার ছাপটাই উঠবে, দস্তানাধারীর হাতের ছাপ উঠবে না। অর্থাৎ দস্তানাধারী ঐ রকম দস্তানা প'রে দেখাতে চাইবে যে আসলে ঐ রকম একটা বাঁদর বা বনমানুষই এসে তালা খুলেছিল, অবশ্য সত্যি যদি যে ছাপ কেউ কখনও

পরীক্ষা করে দেখে। ওতে করে আসল অপরাধীর পাত্তা কোন দিনই পাওয়া যাবে না।

এসব অভাবিত কৌশল, জানি না সরযূপ্রসাদ শিকাগো থেকে শিখে এসেছিল কিনা.....

এসব অভাবিত কৌশল, জানি না সরযূপ্রসাদ শিকাগো থেকে শিখে এসেছিল কিনা। তবে ওখানকার গোয়েন্দাদের কাছে কখনও এ রকম কোন ঘটনার কথা শুনি নি, বা বই-এও পড়িনি। যাই হোক, ঐ নকল বাঁদুরে আঙুলওয়ালা দস্তানা নিশ্চয়ই সরযূপ্রসাদরা অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিল।"

সতীনাথ বাবু বোধ হয় একটানা কথা বলতে বলতে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি একটু থামতেই সুশান্ত জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু ওভাবে জানোয়ারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নকল করা যায় বুঝি? কারা করে?"

সতীনাথ বাবু বললেন, "তুমি হয়তো দেখেছ, বড় বড় শহরে ফুটপাথে কোন কোন লোক নানা রকম তুকতাকের ওষুধ, জড়িবুটি ইত্যাদি সাজিয়ে বসে। বাঁদরের মাথার খুলি, সাপের চামড়া, ধনেশ পাখির ঠোঁট, বাঘের দাঁত ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস থাকে তার মধ্যে। ওদের কাছে বাঁদরের লোমশুদ্ধ কাটা হাতও আমি দেখেছি। কিন্তু সে হচ্ছে মাংসটাংস খুঁচিয়ে বার করে নেবার পর রোদে শুকোনো হাত, তার মধ্যে লোমটোম ঠিকই লেগে থাকে বটে, কিন্তু চামড়াটামড়া সব শুকিয়ে এমন শুঁটকো হয়ে যায় যে সজীব হাতের সঙ্গে তার কোনই মিল থাকে না। তার আঙুলের ছাপ নিলেও দেখা যাবে সে ছাপ এমন কুঁচকেমুচকে গেছে যে তা নিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। ওর জন্য চাই টাটকা আঙুল। কিন্তু তা তো আর সহজলভ্য নয়, তাই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়।

তুমি তো কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অনেকবার গেছ। সেখানে ম্যামেল অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের গ্যালারি নিশ্চয়ই দেখেছ। এও হয়তো দেখেছ যে সেখানে নানা রকম জীবজন্তুকে এমন কৌশলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন জ্যান্ত জন্তুরাই তোমার সামনে বসে আছে। অবশ্য একটু ভালো করে তাকালে ভুলটা ধরা পড়বে। কিন্তু যদি ইয়োরোপ বা আমেরিকার কোন আধুনিক ন্যাচারাল হিস্ট্রীর মিউজিয়ামে যাও তা হলে আরও তাজ্জব বনে যাবে। সেখানে বিভিন্ন জীবজন্তু এমন অদ্ভুতভাবে রাখা হয়েছে যে তারা সজীব না নির্জীব তা বহুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে দেখেও ঠাহর করা যায় না। ওখানে আজকাল এসবই বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা হয়। যেটাকে আসল চামড়া ভাবছ সেটা কিন্তু চামড়াই নয়—ওগুলি প্লাস্টিকের তৈরি নকল চামড়া। কিভাবে করা হয় তাও আমি দেখেছি। মৃত জন্তুর চামড়ার ওপর তরল প্ল্যাস্টার ঢেলে দিলে সেই প্ল্যাস্টার যখন জমাট বাঁধে তখন সেটা ঐ জন্তুটারই দেহের একটা চমৎকার ছাঁচ তৈরি করে দেয়। এবার ঐ ছাঁচটা বার করে নিয়ে সেই ছাঁচের মধ্যে জন্তুটির গায়ের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সেই রঙের তরল প্ল্যাস্টিক ঢেলে দেওয়া হয়। রঙ নির্বাচনের সময় অবশ্য খুব সতর্ক হতে হয়। একটু পরেই ভিতরকার সেই প্ল্যাস্টিক জমে যায়। তখন সমস্ত ছাঁচটাকে জলে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে চেঁছে ফেললেই প্ল্যাস্টিকের তৈরি নকল চামড়া নিয়ে পুরো জন্তুটিই বেরিয়ে আসবে। আর, সে চামড়া এত স্বাভাবিক দেখাবে, যে বিশ্বাসই হবে না ওটা আসল চামড়া নয়, নকল চামড়া। বেশি লোম বা পালকওয়ালা প্রাণীর বেলায় তরল প্ল্যাস্টারের বদলে তরল মোম দিয়ে ছাঁচ বানানো হয়। তারপর সে মোম জমে গেলে চামড়াটাকে সাবধানে নষ্ট করে ফেলা হয়। চামড়া নষ্ট হলেও লোম বা পালকগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না, সেগুলো মোমের ছাঁচের ভিতরের দিকে ঠিক লেগে থাকে। এইবার সেই ছাঁচের ভিতর প্ল্যাস্টিক ঢালাই করলে খানিক পরে দেখা যাবে প্ল্যাস্টিক জমে গেছে এবং লোম বা পালকগুলো সেই প্ল্যাস্টিকের গায়ে এমন ভাবে আটকে আছে যে দেখে বুঝবার উপায় নেই যে সেগুলো সত্যি সত্যি তার গায়ে গজায় নি—ঠিক যেমনটি আসল চামড়ার গায়ে ছিল অবিকল তেমনি নকল প্ল্যাস্টিকের চামড়ার গায়েও লেগে আছে। গোটা জন্তু সম্বন্ধে যা বললাম তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম খাটে। অর্থাৎ ঐভাবে ছাঁচ তৈরি করে নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকেও স্বাভাবিক চেহারা দেওয়া যায়। কিন্তু—" (ক্রমশঃ)

দমকল আবিষ্কারের কাহিনী

নির্মলকান্তি ঘোষ

কোথাও আগুন লাগলে দমকলকে ঘণ্টি বাজিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে দেখি। তখন জনবাহনের জট থাকলেও দমকল যাতে যেতে পারে তার রাস্তা করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, যাবার সময় তারা ট্রাফিক সিগন্যাল পর্যন্ত মানে না। মানতে তারা পারে না। কারণ দেরি হয়ে গেলে সমূহ বিপদ। তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে এক বা একাধিক দমকল আগুনকে আয়ত্তে আনে বা অগ্নিদগ্ধ মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। কাছাকাছি জায়গা থেকে হাইড্রেনের সাহায্যে জল এনে আগুনকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। অনেক সময় আবার কাছেপিঠে জল পাওয়া যায় না। এসব চিন্তা করে দমকল বাহিনী নিজেরাই গাড়ির ট্রাঙ্কারে কিছু জল মজুত রাখে। এবং সঙ্গে রাখে যান্ত্রিক মই বা টর্নিটেবল। বহুতল বাড়ির আগুন নেভাতে এই মই খুব সাহায্য করে।

দমকলের কাজ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল। দমকলের আবিষ্কারের ইতিহাস যেমন পুরনো, তেমনি বিস্ময়করও বটে। শোনা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে মিশরে প্রথম দমকল বাহিনী গঠিত হয়। তখন পাম্প মেসিন এবং গাড়ির আবিষ্কার হয় নি। কত গুলো লোক এক বিশেষ ধরনের ধাতব পাত্রে জল এনে আগুনের উপর ঢালতো এবং ধুলোবালিও ছড়াতো।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, গ্রীকরাও দমকল বাহিনী গঠন করেছিল। তবে আধুনিক দমকল বাহিনী গড়ে উঠেছিল রোম রাজাদের আমলে। এদের বাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক, তেমনি লোকও। গাড়ি টানতো ঘোড়ায়। আর এরা আগুন আয়ত্বে আনার জন্যে মাটি, বালি এবং জল ব্যবহার করতো।

এক সময় রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো। এরপর দমকল বাহিনী তেমন কোথাও জোরদার ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু দেশের জনগণের স্বার্থে এদের রাখা প্রয়োজন। এ কথাটা একদিন লণ্ডন ঠেকে শিকলো। হঠাৎ 1666 খ্রীষ্টাব্দে ঘটলো এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, যা বর্ণনা করার ভাষা কেউ খুঁজে পায় না। যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের জিনিস আর না ঘটতে পারে তার জন্যে জন-সাধারণের তরফ থেকে তীব্র ভাষায় দাবি উঠলো এবং সেই সঙ্গে ধিক্কার জানালো রাজপ্রধানদের। তারপর শোনা যায়, 1666 খ্রীষ্টাব্দেই লণ্ডনে দমকল বাহিনী গড়ে উঠলো এবং সরকার আগুন নেভানো ও সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করলেন। এ

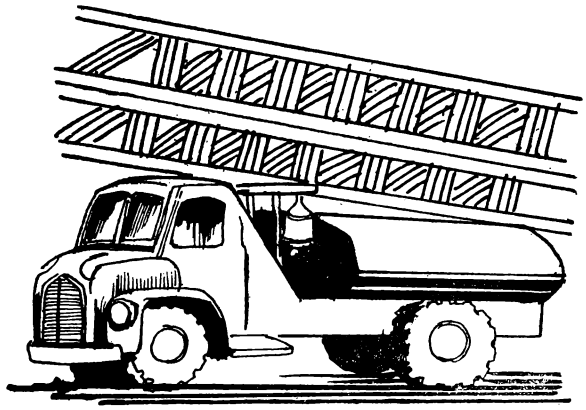

ব্যবস্থা অনেকটা গ্রীস ও রোমের মতন।

আগের মতন এখন আর মানুষ জল ঢেলে আগুন নেভায় না। এখন সে কাজ করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন। আবার ঘোড়ার গাড়ির স্থান দখল করেছে গাড়ি। ইংল্যাণ্ডের দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও দমকলের অনেক উন্নতি ঘটেছে। তারপর আবিষ্কার হলো পেট্রল ইঞ্জিনের। ফলে এখন দমকল বাহিনী আধুনিক রূপ নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা শুনলে আমাদের স্বভাবতই গর্ব বোধ হবে যে, এশিয়ায় প্রথম দমকল বাহিনী গড়ে উঠে আমাদের এই কলকাতা শহরে। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ভারতের শাসন-ভার ছিল। 1822 থেকে 1911সাল পর্যন্ত দমকলের একমাত্র কেন্দ্র ছিল ডালহৌসি পাড়ার লালবাজার। পরে এই দমকলের সংখ্যা বহু বেড়েছে। তেমনি কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে স্থায়ীভাবে। এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর বিদেশ থেকে উন্নত মানের আগুন নেভানোর যন্ত্র-পাতি আমদানি করা হয়েছে।

এ ছাড়া, ছোটখাটো আগুনকে আয়ত্বে আনার জন্যে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। দ্রুত কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে আগুনকে আয়ত্তে আনার জন্যে এই যন্ত্র। এ ধরনের যন্ত্র অফিস, সিনেমাহল, কল-কারখানা ইত্যাদি জায়গায় দেখা যায়। আবার কার-খানার তেল বা পেট্রল প্রভৃতি নেভানোর জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে ফটকিরি ও সোডিয়াম বাইকারবনেট। এতে জল আদৌ উৎপন্ন হয় না।

দেখা গেছে, আগুন নেভাতে গিয়ে অনেকে বিপদের মুখে পড়েছেন, মারাও গেছেন। তবু সৎকাজের জন্যে সহানুভূতিশীল লোকের কখনো অভাব হচ্ছে না।

128/2, হাজরা রোড, কলকাতা-26

বিজ্ঞান ও কবিতা

শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়

আজকাল বিজ্ঞান বিষয়ক নানা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ছোটদের উপযোগী দুএকটি বিজ্ঞান পত্রিকাও আছে। এটি খুবই শুভ লক্ষণ। কারণ, বিজ্ঞান-চর্চা যত প্রসারিত হবে কিশোর মন ততই বিজ্ঞানমুখী হবে, বিজ্ঞান-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবে। সবাই বিজ্ঞানী হবে তা নয় এবং তা বোধ হয় কেউই আশা করে না। কিন্তু তাদের মন কুসংস্কারমুক্ত হবে। যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে শিখবে। দৈনন্দিন জীবনে চিন্তা অনুভূতি ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকবে এমনটি আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

বিজ্ঞানচিন্তায় অনুভূতির ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিমত হয়তো হতে পারে। কিন্তু যেমন সংবাদ-সাহিত্য তেমনি বিজ্ঞান-সাহিত্যের কথা ভাবলে বিরোধের অবকাশ বড় একটা থাকে না। অবশ্য জ্ঞানবিজ্ঞানে জ্ঞানের দুটি প্রধান শাখা সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে পৃথকভাবে দেখার রীতিই চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। বিজ্ঞান-সাহিত্যকে তাই ঠিক সাহিত্য বলে ধরা হয় না। তা হলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কী? দুটি কি পরস্পর বিরোধী? তত্ত্বকথায় বা তর্কে না গিয়েও সাধারণভাবে বিষয় দুটিকে আমরা যেভাবে দেখি তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তখন মোটামুটিভাবে দুটিকেই আমরা চিনতে পারবো এবং চেনাজানা হলে ভালবাসতেও পারবো।

এই পত্রিকার পাঠকপাঠিকা যারা, সেই কিশোর কিশোরীদের বলছি: মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি বা বাংলায় বিপরীতার্থক শব্দ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর যখন লেখ, গদ্যের (Prose) বিপরীতার্থক শব্দ জানতে চাইলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করবে পদ্য (Verse), তাই না? কিন্তু কবিতার (Peotry) বিপরীত শব্দ কি গদ্য (Prose) বলবে? বোধ হয়, না। কেননা তোমরা তো গদ্য-কবিতার সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং কবি- সমালোচকের কথা উদ্ধৃত করে তোমরা বলবে কবিতার বিপরীত শব্দ গদ্য নয়, বিজ্ঞান (Science)। কারণ-স্বরূপ হয়তো বলবে: কবিতার উদ্দেশ্য যেখানে পাঠক-মনে আবেগ বা অনুভূতি সঞ্চার করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যেখানে আবেগমুক্ত ভাষায় তথ্য পরিবেশন করা। সাধারণ-ভাবে বলবে, কবিতার জগৎ অনুভূতির জগৎ, বিজ্ঞানের জগৎ বস্তু-জগৎ। কেউ কেউ তাই হয়তো বলেছেন বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, কবিতার সেখানে শুরু। কিন্তু এরকম সীমানা টানতে গেলেই বিরোধ বাধবে। যেমন দেশে দেশে সীমান্ত বিরোধ সর্বত্র দেখতে পাচ্ছ। সুতরাং বিরোধে কাজ নেই। আর সত্যিই তো বিরোধ নেই।

জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা পড়ো। বিজ্ঞান সেখানে শুধু সাহিত্যের সামগ্রী নয়, একেবারে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিংবা ধরো আর্থার ক্লার্কের লেখাগুলি। এবার একাল থেকে অতীতের দিকে তাকাই। বিজ্ঞানী ছেড়ে কবিকে দেখি। এক ইংরেজ রোমান্টিক কবির কথা বলছি। বিজ্ঞানচর্চা ওদের দেশেও সেসময়ে তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয় তখনই অ-বিজ্ঞানী স্বপ্ন-প্রেমিক কবির কলমে কবিতা হয়ে উঠেছে। যে কবিতার কথা বলছি সেটি আমাদের একেবারে অচেনা নয়। কেউ কেউ অন্তত পড়েছো। আর যদি না পড়ে থাকো, পড়ে নিও। শেলীর কবিতা। নাম: মেঘ (The Cloud)। মেঘের কথা উঠলেই রবীন্দ্রনাথের গানের সূত্র ধরে মন যেন 'মেঘের সঙ্গী' হতে চায়। 'হংসবলাকার পাখায়' মন তখন উড়ে যায় দিগ্‌দিগন্তের পানে। মেঘের সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে যাই। শেলীর কবিতায় কিন্তু কবি নয়, মেঘ তার নিজের জীবনকথা বলছে—তার জন্মবৃত্তান্ত, উদ্দাম কার্যকলাপ। আপাত মৃত্যু ও মৃত্যুহীন জীবনের কথাই বলছে প্রথম পুরুষে।

মেঘ বলে: 'আমি ধরিত্রীর কন্যা, জলকন্যা। আকাশ আমার ধাত্রী। আমি ক্ষণে ক্ষণে আমার রূপ পরিবর্তন করি। আমার মৃত্যু নেই। বৃষ্টির পর কলঙ্কমুক্ত উজ্জ্বল আকাশ আমার মৃত্যুর কথা ভেবে বাতাস ও সূর্যকিরণের সাহায্যে আমার কবরের উপর নীল চাঁদোয়ার স্মৃতিস্তম্ভ যখন তোলে আমি হাসি। আমার কবর? অদৃশ্য দৃষ্টির গুহা থেকে হঠাৎ করে তখনই আমি উঠে আসি, মাতৃগর্ভ থেকে যেমন শিশু কিংবা কবরের ভিতর থেকে ভূত বেরিয়ে আসে এবং আকাশের নীল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করি।'

সূর্যকিরণে সমুদ্র ও নদীর জলকণা বাষ্প হয়ে উপরে মেঘের রূপ নেয়। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি থেকে মেঘ। বিবর্তনের এই খেলা অহরহ চলে। বিজ্ঞানের এই সত্যকেই শেলী কবিতায় রূপ দিয়েছেন। মেঘ বলছে ঃ 'আমি তৃষ্ণার্ত ফুলগুলির জন্যে প্রাণদায়িনী বৃষ্টিধারা নিয়ে আসি। দুরন্ত দুপুরের স্বপ্নে গাছের পাতা-গুলি যখন বিভোর, তখন তাদের মাথার উপর সুশীতল ছায়া বিছিয়ে ধরি। সূর্যকে ঘিরে নৃত্যের ছন্দে পৃথিবী যখন মায়ের মত দোলা দিয়ে ফুলের ছোট্ট কুড়িগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, মেঘ তার পাখা সঞ্চালন করে ঘুমন্ত কুঁড়িগুলির চোখে ভোরের শিশির ছড়িয়ে দিয়ে ঘুম থেকে তাদের জাগিয়ে তোলে। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা তো বিজ্ঞানের কথা। পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা কী অপরূপ সুষমা ও মমতায় মণ্ডিত !'

মেঘের সঙ্গে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝা. পাইনগাছের ক্ষুব্ধ আন্দোলন, বিদ্যুতের চকিত চমক, বজ্রের ধ্বনি সবই আছে। আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুততর এই সত্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে বিদ্যুৎ ও বজ্রের মাধ্যমে। আকাশপথে মেঘের রথ যখন ছোটে, বিদ্যুৎ তার সারথি। আর বজ্র যেন তার অধীনে গুহার অভ্যন্তরে বিক্ষুব্ধ এক বন্দী। বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকের সঙ্গে শব্দ শোনা যায় না। আর যখন শব্দ কানে আসে, তার আগেই বিদ্যুতের আলো দেখি। চমৎকার এক উপমার সাহায্যে সেই কথাটাই বলা হয়েছে। বন্দী বজ্র যেন থেকে থেকে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। শৃঙ্খল ভাঙার চেষ্টা করছে। তখনই তার বুক ফাটা আর্তনাদ আমরা শুনতে পাচ্ছি। আবার ধনাত্মক ঋণাত্মক তড়িতের মিলনের আকুতিও প্রকাশ পেয়েছে। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ ছুটছে তার ভালবাসার পাত্রীর সন্ধানে। পাহাড় সমুদ্র অরণ্য সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তার অন্বেষণ। এবার অন্য ছবি। বৃষ্টি-স্নানের পর ভিজে মাটি যখন সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করে তখন উপরে আকাশে বিপরীত দিকে ওঠা রামধনু যেন বিজয়ী মেঘের বিজয়তোরণ, যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষে মেঘ তার প্রধান অনুচরদের নিয়ে সগর্বে ফিরে যায় আপন রাজ্যে। বিজ্ঞান এখানে যেন সৌন্দর্যে নিটোল একটি কবিতা। উপমা ও রূপকের সাহায্যে মেঘ, আকাশ, পৃথিবী, সূর্য চন্দ্র তারামণ্ডল এক কথায় সমগ্র চরাচরের পরস্পরের সম্পর্ক সুনিপুণভাবে কবি এখানে এঁকেছেন। ছবির পর ছবি। চলমান ছবি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ছবি। অগ্রজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাতেও বিজ্ঞানের সত্য আছে। 'লুসি' (Lucy) কবিতা মনে করো। বিশেষ করে তার মৃত্যুর কথা যেখানে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের স্বাদ, জীবনের সত্য ও কবিতার সৌন্দর্য সব একসঙ্গে পাবে।

বিজ্ঞানচিন্তা তা হলে সাহিত্যচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু তাই নয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তৃত হচ্ছে, কবিতার দিগন্তও তেমনি প্রসারিত হচ্ছে। চাঁদের কথাই ধরো। আমাদের কাছে যে চাঁদ ছিল এতকাল ধরে মায়াভরা আকাশের সিংহাসনে রানীর মত, কখনো কাস্তের মত, কখনো বা ঝলসানো রুটির মত, সেই দূরের অথচ কাছের চাঁদ আজ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। আজকের কবি মহাকাশচারী মানুষের চোখ দিয়ে চাঁদকে অন্য কোন রূপে দেখবে। অন্য কোন সম্ভাবনার স্বপ্নে সে মগ্ন হবে যখন নতুন সম্ভাবনার সিংহদরজা বিজ্ঞান আজ খুলে দিয়েছে। চাঁদের মাটি তার মুঠোর মধ্যে। তাই বলে চাঁদকে ঘিরে তার স্বপ্ন কিন্তু ফুরিয়ে যাবে না। যেমন বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে মানুষকে এবং মানুষের পৃথিবীকে আমরা চিনেছি জেনেছি। বাইরে থেকে, ভিতর থেকে সেই মানুষকে নিয়ে, মানুষের পৃথিবীকে নিয়ে আমাদের কবিতা তো শেষ হয়ে যায় নি। কোনদিনই যাবে না।

অন্যদিকে কবি তাঁর স্বপ্ন দিয়ে কল্পনা দিয়ে নতুন জগৎ সৃষ্টি করে চলেছেন। বিজ্ঞানী তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সেখানেও তার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। সে জগৎ কখনো তাঁর দূরবীনের সীমার মধ্যে, কখনো বা অনুবীক্ষণী দৃষ্টির মধ্যে। কখনো তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে, কোন রহস্যলোকে। তবু বিজ্ঞানীর সন্ধান শেষ হবে না। বিজ্ঞান ও কবিতা অর্থাৎ সাহিত্য এইভাবে পাশাপাশি চলছে। একে অন্যের প্রেরণা হয়ে। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়ে। তাদের প্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন। মাধ্যমও আজ ভিন্ন। কিন্তু একদিন আসবে যখন দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে সনাক্ত করা হয়তো কঠিন হবে। শেলীর মেঘ কবিতাটিতে কি তারই পূর্বাভাস ? অন্তত বিজ্ঞান-ভাবনার সঙ্গে কবিতাভাবনা অর্থাৎ সাহিত্যভাবনা যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে একথাটা স্বীকার করতেই হবে, তাই না ?'

বেলগাছিয়া ভিলা, কলকাতা-37।

একটি সৌখিন চিরহরিৎ বৃক্ষ

নির্মাল্য চক্রবর্তী

বিশাল এই বনস্পতিজগতে একটা দুটো কি আবার হাজার হাজার সৌখিন চিরহরিৎ বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে বেশ কিছু গাছ আমরা হামেশাই দেখে থাকি। যেমন দেবদারু ইউক্যালিপটাস, পাম ইত্যাদি। দেবদারু ও ইউক্যালিপটাস গাছ দুটির আদর একটু বেশি। এই দুটো গাছ অনেক বড় বড় বাগানবাড়ির সৌন্দর্যকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলে। একটু মেজাজী লোক হলে তিনি আর কোনো গাছ লাগান চাই না লাগান, দুই একটা ইউক্যালিপটাস বা দেবদারু গাছ তাঁর বাড়ির সীমানায় লাগাবেনই। এখানে ইউক্যালিপটাস গাছ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

এ গাছটার বিষয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে 'ইউক্যালিপটাস' নাম হওয়ার পিছনে কি ইতিহাস থাকতে পারে। 'ইউক্যালিপটাস' কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। যার শাব্দিক অর্থ এই Eu=well এবং Kalypto=I Cover যখন 1770 খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন কুক নামে এক সাহেব তাঁর নিজের জাহাজে করে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিলেন তখন তাঁর সঙ্গী হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার দুই উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জোসেফ সোলানডার এবং ডানিফেল কার্টও ছিলেন। হঠাৎ যেতে যেতে তাঁরা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের পূর্ব উপকূলভাগে এই গাছটির খোঁজ পেয়েছিলেন। সেইদিন থেকে এই গাছটি বনস্পতি জগতের এক নতুন সদস্যরূপে সবার কাছে পরিচিত হলো। তবে গাছ সম্বন্ধে বিস্তর খবরাখবর পাওয়া গেল 1789 খ্রীষ্টাব্দে এবং এই সৌখিন গাছটার প্রথম নামকরণ করলেন এক ফরাসী বিজ্ঞানী, যাঁর নাম এল হেরিটার। প্রকৃতপক্ষে গাছটার উৎপত্তিস্থল হলো অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে। ভারতবর্ষে এই গাছের আগমন 1843 খ্রীষ্টাব্দে। ক্যাপটেন কটন প্রথমে গাছটিকে মাদ্রাজে এনে লাগালেন। প্রায় 600টি প্রজাতি বিশিষ্ট এই গাছ পৃথিবীর সর্বত্র সমতলভূমি থেকে শুরু করে পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। আকারের দিক থেকে 3m উচ্চতাবিশিষ্ট গুল্ম থেকে শুরু করে 109-120m পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের Red-Wood Tree-র পরেই আকারের দিক থেকে Eucalyptus regans-এর স্থান। গাছগুলির কাণ্ড সাধারণতঃ লম্বা, মসৃণ, সোজা ও অনেকটা সাদা রঙের হয়। যে মাটিতে বালুর মাত্রা কম, সাধারণত দোঁআশ মাটিতে এ গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। গাছটি কণ্টকবিহীন ও কোনোরকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ এ গাছে নেই। Myrlaceae familyভুক্ত এই গাছের কাণ্ডের ব্যাস 3 10m পর্যন্ত হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই গাছের গুরুত্ব যথেষ্ট হওয়ায় সারা পৃথিবীতে এ গাছের চাষ হচ্ছে। এই গাছের কাঠ ভীষণ মজবুত, যা দিয়ে নানারকম আসবাবপত্র তৈরী হয়। প্রায় 60-70 রকম

প্রজাতি বিশিষ্ট এই গাছকে কেবল কাঠের প্রাচুর্যের জন্যেই চাষ করা হয়। কিছু কিছু জাতের গাছের বিস্তার এত ঘন হয়, যে কারণে অনেক দেশে রাস্তার সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে দুধারে এই গাছকে লাগানো হয়। গাছের প্রায় প্রত্যেকটি ভাগ থেকে শিকড় থেকে শুরু করে ফুল পর্যন্ত একরকমের সুন্দর তেল বের হয়। এই Eucalyptus Oil আবার সাবান, নানারকম সুগন্ধী নির্মাণ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভারী ও কুটির দুই শিল্পে এই তেলের যথেষ্ট ব্যবহার হয়ে থাকে। লজেন্স, নানারকম সুস্বাদু খাবারদাবারও এই তেল থেকে তৈরী হয়। কোনো কোনো গাছে আঁশের এর মাত্রা এত বেশি হয় যা দিয়ে কাগজ, নিউজপ্রিণ্ট ইত্যাদি জিনিস তৈরী হয়। ভেষজবিজ্ঞানে এ গাছের গুরুত্ব কিছু কম নয়। বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া নিরোধক ভেষজ নির্মাণে এ গাছের ব্যবহার প্রচুর। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের আদিবাসীরা ফল, মধু ও শিকড়কে নিজেদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। কিছু কিছু প্রজাতির গাছ থেকে ট্যানিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ বের হয় যা চামড়া কারখানায় খুব বেশি ব্যবহার হয়। মরক্কো, আলজিরিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলি মরুভূমির কাছে হওয়ায় সেখানে চাষাবাদের ভীষণ অসুবিধা। তাই কিছু প্রজাতির গাছ, যেগুলো মরুভূমিতেও হয়, চাষ করে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটাতে সেখানকার লোকেরা সমর্থ হয়েছে। যার ফলে সেই সমস্ত জায়গায় বৃষ্টির পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়ে চাষাবাদের সুবিধা হয়েছে।

আমাদের দেশে ইউক্যালিপটাসের প্রায় 70টি প্রজাতি পাওয়া যায়। বিশেষত; নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে এর প্রাচুর্য। 1856-1875 এর মধ্যে ক্যাপটেন কটনের প্রচেষ্টায় সেই অঞ্চলে এই গাছের চাষ প্রচুর হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই গাছের বিভিন্ন সংকর উদ্ভিদের জন্ম দিতে পেরেছেন। F_1, F_4, F_5 উল্লেখ-যোগ্য সংকর উদ্ভিদ। এই কাজে দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট-এর নাম সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয়। এই গাছ সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানীদের সাফল্য প্রকাশ পায় 1979-এ বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে। আজকাল বিজ্ঞানীরা টেস্টটিউবের মধ্যে এই গাছের টিসু কালচার করে নতুন গাছের জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছেন। ইদানীং বিস্তর এলাকা জুড়ে এই গাছের চাষ হচ্ছে।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক অনুসন্ধানের দ্বারা এই গাছ থেকে আমরা হয়তো আরও বেশি লাভবান হতে পারব।

সিংহ লজ, কাস্টার্ম টাউন, বি-দেওঘর।

• মজার ছবি •

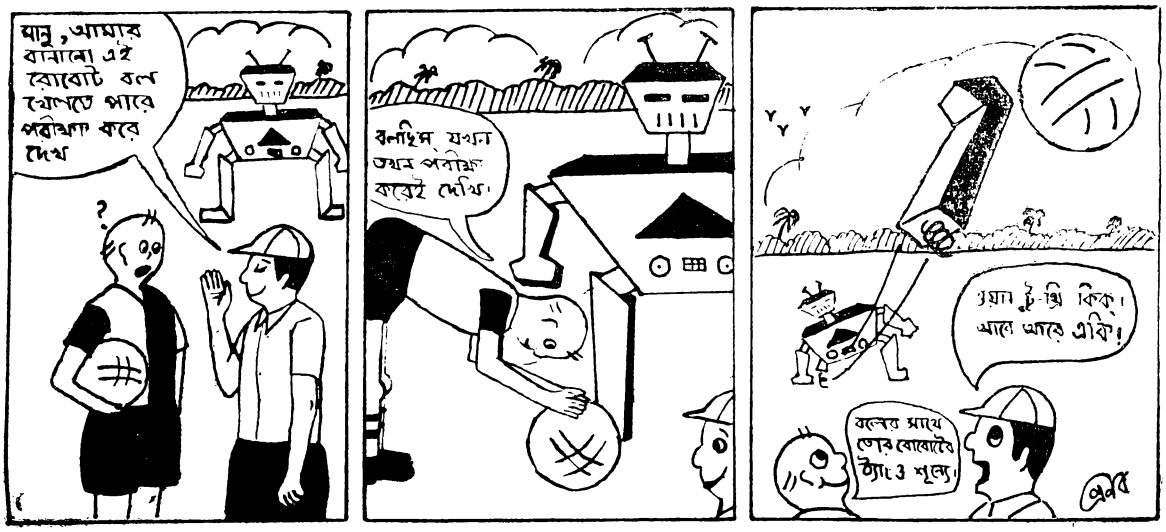

প্রাণীজ সৌরভ

সুনীত রায়

মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ। দিনক্ষণ ঠিক মনে নেই। ট্রেনে করে আমরা সবাই ঘাটশিলা বেড়াতে যাচ্ছিলাম। এই বেড়ানোর মধ্যে একটা আলাদা আকর্ষণ হলো শমীকদার মজাদার গল্প। ট্রেনে কত কি'ই না বিক্রি হচ্ছে। চা, বাদাম, ঝালমুড়ি থেকে শুরু করে খাতা কলম অব্দি। হঠাৎ দেখি, এক জটাধারী সন্ন্যাসী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে মিতুলের হাতটা খপ করে ধরে বললেন, 'চিন্তা করার কিছু নেই, পরীক্ষায় ভালোই ফল পাবি। এবার হাতটা শুঁকে দেখ তো কোন গন্ধ পাস কিনা?' সত্যি সত্যি মিতুলের হাতে শুধু নয়, সারা ট্রেনের কামরাটা একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধে ভরে গেল।

সাধুবাবা গম্ভীরভাবে মিতুলকে বললেন, এটা হলো কস্তুরীর গন্ধ। আমার কাছে যে কস্তুরী আছে তা হলো দৈবসিদ্ধ কস্তুরী। এটা কাছে রাখলে, পরীক্ষা নিয়ে কোন মাথাব্যথা থাকবে না। অবশ্য এর দাম খুব একটা বেশি নয়, মাত্র দুশো টাকা। এতক্ষণ শমীকদা চুপ করেই ছিল। এবার হাসতে হাসতে শমীকদা বললো, দু'টাকা হলে নিতে পারি। কথাটা শোনামাত্রই সাধুবাবার চোখটা এমন ধক করে জ্বলে উঠলো, যা দেখলে মনে হবে, এই বুঝি সব ভস্ম হয়ে গেল। মজার ব্যাপার, সাধুবাবা কোন কথা না বলে স্টেশন আসতেই নেমে গেলেন।

এসব কস্তুরী কোনটাই আসল নয়। আসল কস্তুরী খুবই দুর্লভ আর দামও তেমনি। কস্তুরীই আমাদের কাছে সব থেকে পরিচিত প্রাণীজ সৌরভ, কথাগুলো একসঙ্গে বলে শমীকদা একটু থামল। আমরা বুঝতে পারলাম, শমীকদার গল্প শুরু হয়ে গেছে। তাই কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। শমীকদা বললো, যে কৃষ্ণসার হরিণ থেকে এই অতুল সুগন্ধ পাওয়া যায়, তাদের হিমালয়ের অনেক উঁচুতে দেখা যায়। এদের চেহারা অনেকটা ছোট বাছুরের মতো। আর গায়ের রঙ্ ধূসর-বর্ণের। এই হরিণ শিকার করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার; কারণ *এরা হলো নিশাচর। সামান্য বিপদের আঁচ পেলেই* বিদ্যুৎবেগে এক খাড়াপাহাড় থেকে আর এক খাড়া পাহাড়ে অনায়াসে লাফিয়ে পড়তে পারে।

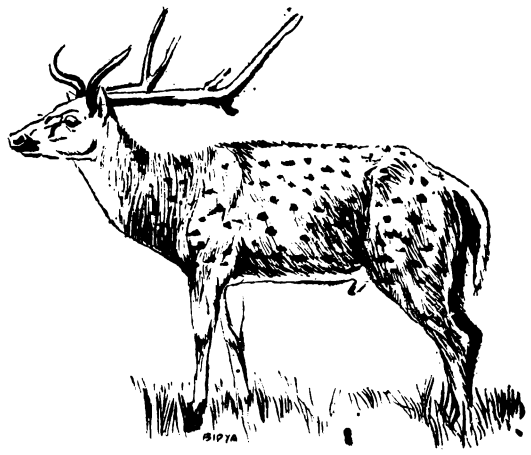

কৃষ্ণসার হরিণ

আমাদের অনেকের ধারণা, মৃগনাভিতেই বুঝি কস্তুরী পাওয়া যায়। এই ধারণাটা ঠিক নয়, মৃগনাভির কাছে একটা থলিতে কস্তুরী পাওয়া যায়। আর কেবল প্রজনন-কালেই এটা পরিপুষ্ট হয়। প্রজননের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় এই গন্ধ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র পুরুষ হরিণের শরীরেই কস্তুরী পাওয়া যায়। কস্তুরী সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র হলো পশ্চিম হিমালয়ের কাশ্মীর, মধ্য হিমালয়ের নেপাল, তিব্বত আর সিকিম।

সৌরভজগতে কস্তুরীর মতো সিভেটও এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই গন্ধ এক ধরনের বেড়ালের গা থেকে বেরোয়। বাঙ্গালোরের গ্রামাঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায়। গন্ধে আকুল করে দেয় বলে এদের আঞ্চলিক নাম 'গন্ধনাকুলী'। গন্ধনাকুলী যেখান দিয়ে হেঁটে যায়, সেখান থেকেই খুব সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। গৃহ্যদ্বার আর জননেন্দ্রিয়র মধ্যবর্তী এক বিশেষ অংশ থেকে এই গন্ধের উৎপত্তি। উত্তরভারতের থেকে দক্ষিণভারতের গন্ধনাকুলীর গন্ধ অনেক বেশি উগ্র। এজেন্স বা ওষুধ তৈরীতে এই গন্ধ ব্যবহার করা হয়। মূল্যবান গন্ধের আকর হলেও এদের একটা খুব ভালো চোখে গৃহস্থেরা দেখে না। এদের তীব্র গন্ধ আর গলার শব্দ কোন কোন জায়গায় অমঙ্গলসূচক বলে মনে করা হয়।

শুনলে অবাক লাগে, সমুদ্রসম্রাট তিমির শরীর থেকেও একধরনের সুগন্ধ পাওয়া যায়। এর নাম হলো 'এম্বারগ্রিস'। এই গন্ধ সব তিমি থেকেই পাওয়া যায় না। অক্টোপাস জাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করে অনেক সময় তিমি তা হজম

করতে পারে না। ঠোঁট ও অন্যান্য দুষ্পাচ্য অংশ পাকস্থলীতে জড়িয়ে এক ধরনের ঘায়ের সৃষ্টি করে। ঐ ঘা থেকে এম্বারগ্রিসের উৎপত্তি। এজন্যে এটা খুবই দুর্লভ।

কুমীরের মতো সর্বভুক প্রাণীর দাঁত থেকে এক ধরনের গন্ধ বেরোয়, যা প্রায় কস্তুরীর মতো। কি করে এই গন্ধ তৈরী হয়, তা আজও আমাদের অজানা। যদি এর উৎপত্তি জানা যায় আর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করা যায়, তা হলে এর মূল্য যে চামড়ার থেকেও বেশি হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উত্তর আমেরিকায় 'বীভর' বলে এক ধরনের বেড়াল পাওয়া যায়, তাদের গা থেকেও সুগন্ধ পাওয়া যায়। এই সুগন্ধির নাম 'ক্যাস্টোরিয়াম'। বীভর কানাডাতেও বিশেষ-ভাবে পালন করা হয়। সাধারণত ক্যাস্টোরিয়াম কিছু মূল্যবান গন্ধসারে ব্যবহার করা হয়।

আচ্ছা শমীকদা, তুমি তো শুধু সুগন্ধীর কথাই বলে যাচ্ছ। দুর্গন্ধ আছে এমন কোন প্রাণী নেই? কথাটা বলে গোরা শমীকদার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শমীকদা বললো, অনেক প্রাণী আছে যারা দুর্গন্ধের অধিকারী। উত্তর আমেরিকার 'স্কঙ্ক' নামে এক ধরনের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এদের চামড়া গরম পোষাক তৈরীর কাজে লাগে, খুবই মূল্যবান। দূরে যখন দল বেঁধে ওরা ঘুরে বেড়ায় তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগে। কিন্তু কাছে গেলেই দুর্গন্ধের পিচকারী চালিয়ে দেয়। এই গন্ধ বিষ্ঠার থেকে বহুগুণ তীব্র দুর্গন্ধ। স্কঙ্কের এই গন্ধ নিক্ষেপ করার অঙ্গটি এত শক্তিসম্পন্ন যে এই গন্ধধারা 16 থেকে 18 হাত দূর পর্যন্ত যেতে পারে। স্কঙ্কের চামড়া খুবই প্রয়োজনীয় বলে গৃহদ্বারের পাশে দুর্গন্ধের থলিটা কেটে দেওয়া হয়। এতে অবশ্য প্রাণীর কোনো ক্ষতি হয় না।

আমাদের দেশেও বহু দুর্গন্ধযুক্ত জীব আছে। এদের মধ্যে সব থেকে সাধারণ হলো গাঁধিপোকা বা গন্ধপোকা। এদের শরীরে এত দুর্গন্ধ যে ঘরে দু' একটা ঢুকলেই ঘর গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যায়। এই পতঙ্গের শরীরে গন্ধোৎ-পাদক তেলের পরিমাণ $15\frac{1}{2}$ গ্রেনের বেশি নয়। বাঘ, সিংহ, শকুনির গায়ের দুর্গন্ধের সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত।

এরকম কত জীবজন্তু, পোকা-মাকড় আছে যারা এ-ধরনের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধের অধিকারী। রহস্যময়ী প্রকৃতির রহস্যজালে এখনও কত কিছু লুকিয়ে আছে তা আজও আমাদের অজানা।

701 ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলি-34,

আমাদের প্রকাশিত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন (১ম ও ২য় খণ্ড)
—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন—ডঃ রণজিৎ দাস

উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা (১ম ও ২য়)
—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, ডঃ অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুরদীশচন্দ্র দত্ত

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক জীববিদ্যা—ঐ

উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান—ডঃ প্রতীপকুমার চৌধুরী ও ডঃ নিতাই মুখোপাধ্যায়

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান
—অধ্যাপক বাদলকুমার বেতাল

দর্শনশাস্ত্রের ভূমিকা—ডঃ বিশ্বনাথ সেন

ভাষাচর্চা ও সাহিত্যকথা (উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা দ্বিতীয় পত্র)—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ নির্মলকুমার দাশ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ—ডঃ শ্যামল সেনগুপ্ত

Higher Secondary English Grammar & Composition—Debkumar Chatterjee

সাহিত্য-শ্রী (অলংকার, ছন্দ ও সাহিত্যের ইতিহাস—উচ্চমান বাংলা)—ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী

Books in English Medium :

An Introduction to Higher Secondary Biology (Part I)—Dr. B. N. Sanyal & Dr. A. K. Chatterjee

An Introduction to Higher Secondary Biology (Part II)—Dr. B. N. Sanyal, Dr. A. K Chatterjee & Dr. M. De

An Introduction to Higher Secondary Chemistry—Dr. Ranajit Das

Business organisation
—Prof Bilaskumar Biswas

H. S. Accountancy—Prof Khara & Prof Ghosh

ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯
(ফোন : ৩৫-৪৫৩৪)

জ্বর কোন রোগ নয়

সুনির্মল রায়

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, জ্বর কোন রোগই নয়। কথাটা কি ঠিক? হ্যাঁ, ডাক্তারদের তাই মত। তাঁরা বলবেনঃ জ্বর আসলে অন্য কোন রোগের একটা উপসর্গ। আমাদের শরীরে সব সময় কিছু তাপ তৈরী হচ্ছে আর কিছু তাপ ক্ষয় হচ্ছে। এই তৈরী তাপ এবং ক্ষয় পাওয়া তাপের মধ্যে সুস্থ সময়ে একটা সমতা থাকে। কিন্তু মানুষের শরীরে অন্য রোগ হলে এই তৈরী তাপ আর ক্ষয় পাওয়া তাপের মধ্যে সমতা নষ্ট হতে পারে। সমতা নষ্ট হয়ে যদি তৈরী তাপের পরিমাণ ক্ষয় পাওয়া তাপের চাইতে বেশি হয় তবে সেই বাড়তি তাপ শরীরে প্রকাশ পায়, যেটাকে আমরা জ্বর বলি। আসলে সেই রোগ, যার জ্বর একটা উপসর্গ, নির্মূল করলেই জ্বর কমে যায়। অবশ্য সেই রোগকে না সারিয়েও জ্বর কমানো যায়। তার জন্যে নানা পথ আছে। 'ক্যালপল' ট্যাবলেট খেলে, ক্রোসিন সিরাপ খেলে ইত্যাদি পদ্ধতিতে গায়ের তাপ কমানো যায়। জ্বর বেশি হলে মাথা ধুইয়ে কপালে জলপটি দিয়ে আস্তে আস্তে মাথায় হাতপাখার হাওয়া করলেও তাপমাত্রা নেমে আসে। হোমিওপ্যাথিতেও তাপমাত্রা কমাবার, জ্বর কমাবার ওষুধ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা আবার বলছি, জ্বর আসলে কোন রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গমাত্র। তাই কারো জ্বর হলে দেখতে হবে—জ্বর কি রোগের জন্য হয়েছে। চিকিৎসা সেই রোগেরই করা উচিত। সেই রোগ কমে গেলেই জ্বর কমে যাবে। জ্বর হলেই ক্যালপল ইত্যাদি ট্যাবলেট না খাওয়াই ভাল। জ্বর তা হলে সাময়িককালের জন্যে কমলেও আবার হবার সম্ভাবনা থাকে। হোমিওপ্যাথিতে জ্বর অবশ্য উপসর্গই

বেশিবার পায়খানায় গিয়ে অনেকে কাহিল হয়ে পড়েন। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে, বেশ শ্বাসকষ্ট হয়। তখন করণীয় কি? ডাক্তার তো ডাকতেই হবে। তবে তার আগে প্রাথমিক চিকিৎসা আপনিও করতে পারেন। আধ কাপ গরম জল একটু ঠাণ্ডা করে তাতে এক চামচ চিনি ও একটু নুন দিয়ে গুলে নিন। তারপর আস্তে আস্তে কিছু সময় অন্তর অন্তর এক চামচ/দুই চামচ করে জল রোগীর মুখে ঢেলে দিন। এভাবে আর একটু বেশি জল তৈরী করে অনেকক্ষণ ধরেও রোগীর সেবা করতে পারেন। এর ফলে স্যালাইনের কাজ হবে। রোগীর শ্বাসকষ্ট অনেক কম হবে। তবে বেশি শ্বাসকষ্ট হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা করাই ভাল।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক শ্বাসের রোগীদের কি করা উচিত? ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা উচিত তার শ্বাসকষ্ট কিসের জন্যে হচ্ছে—পলিপাসের জন্যে, না সাইনাসের জন্যে, না অন্য কোন কারণে। প্রত্যেক রোগের জন্যে আলাদা চিকিৎসা। অনেক সময় পেটের গ্যাস উপরে উঠে শ্বাসকষ্ট দেয়। আসল কারণটা খুঁজে তার চিকিৎসা করা উচিত। তবে ডাক্তাররা বলবেনঃ শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্যে আরও কিছু করণীয় আছে। রোজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় ঈষদুষ্ণ জল নাকের ফুটো দিয়ে টানতে হবে এবং মুখ দিয়ে সে জল বের করতে হবে। মুখ দিয়ে না বার করতে পারলে নাক দিয়েই বার করতে হবে। এভাবে বেশ কয়েকবার করতে হবে। রাত্তিরে শোবার আগে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করে সেই জল নাক দিয়ে টেনে মুখ দিয়ে বার করতে হবে। এরকম বেশ কয়েকবার করতে হবে। এভাবে রোজ করলে নাকের ফুটো এবং শ্বাসনালী অনেকটা পরিষ্কার থাকে। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসও বেশ স্বাভাবিকভাবেই হয়।

এই প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার চোখের যত্নের কথাও বললেন। বললেন—বার বার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া খুবই ভাল। তবে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে করলে চোখ ও অন্যান্য স্নায়ু আরও ভাল থাকে। মুখে ঠাণ্ডা জল নিয়ে মুখ ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে ফুলিয়ে রাখতে হবে। এই সঙ্গে চোখে এবং ঘাড়ে বার বার ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে হবে। তারপর মুখের জল ফেলে আবার নতুন জল মুখে নিয়ে আবার এরকম করতে হবে। এভাবে বার বার করলে চোখের স্নায়ু এবং পারিপার্শ্বিক স্নায়ু সতেজ থাকে। অন্য জায়গার দুর্বল স্নায়ুকে সবল করবার নানারকম ব্যায়াম আছে, নানারকম মানসিক প্রক্রিয়া আছে। এগুলি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শই করা ভাল। অম্বল ও গ্যাসের চিকিৎসাও ডাক্তারের পরামর্শই মতোই হওয়া উচিত। অযথা একগাদা ডাইজিন ইত্যাদি ট্যাবলেট না খাওয়াই ভাল। বেশি খেলে এগুলোতে পরে ভাল কাজ হয় না। তবে গ্যাসের রুগীদের একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, পেট কখনো খালি রাখা উচিত নয়। আর সব রকম খাদ্য, শাক ইত্যাদি যা খেলে গ্যাস হতে পারে, সেসব খাদ্য না খাওয়াই ভাল। অনেক গ্যাসের রুগীকে বার বার শুকনো মুড়ি খেতে দেখা যায়। এটা মন্দ নয়। আর মুড়িতে তো কোন ক্ষতিই হয় না।

ছবি কুটির, রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই

পদার্থবিদ্যা ঃ

পদার্থের ধর্ম (২য় সংস্করণ) —দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
পরমাণু ও কেন্দ্রীন—দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	২১·০০
জ্যামিতীয় আলোকবিজ্ঞান—অরবিন্দ নাগ	১৯·০০
তাপগতিতত্ত্ব—অশোককুমার ঘোষ	২৪·০০
পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা – দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	১০·০০
আলোকের সমবর্তন -- সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২·০০
গ্যাসের আণবিকতত্ত্ব—প্রতীপকুমার চৌধুরী	১২·০০
নিম্নতাপমাত্রা বিজ্ঞান ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী	১২·০০
ভৌত আলোকবিজ্ঞান—বিজয়শংকর বসাক	২০·০০
উচ্চতর স্বনবিদ্যা— যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়	২০·০০
আপেক্ষিকতা তত্ত্ব—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	২০·০০

রসায়ন ঃ

বৈশ্লেষিক রসায়ন—অনিলকুমার দে ও অসিতকুমার সেন	১৭·০০
ভৌত রসায়ন—নিত্যানন্দ কুণ্ডু	২২·০০
ইউরেনিয়ামের ওপারে – অনিলকুমার দে	৯·০০
ব্যবহারিক জৈব রসায়ন—জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য	১১·০০

পর্ষদ প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তিকা ঃ

রোগ ও তার প্রতিষেধক—সুখময় ভট্টাচার্য	৫·০০
পেশাগত ব্যাধি—শ্রীকুমার রায়	৭·০০
আমাদের দৃষ্টিতে গণিত—প্রদীপকুমার মজুমদার	৭·০০
বয়ঃসন্ধি—বাসুদেব দত্তচৌধুরী	৯·০০
পশুপাখীর আচার ব্যবহার-- জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	৮·০০
ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি—সঙ্কর্ষণ রায়	৮·০০
একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ—কানাইলাল মুখোপাধ্যায়	১০·০০
শক্তি ও বিভিন্ন উৎস—অমিতাভ রায়	৭·০০
মানুষের মন—অরুণকুমার রায়চৌধুরী	৪·০০
গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি—দুর্গা বসু	১০·০০
ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার—ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	৬·০০
হাঁপানি রোগ মনীশচন্দ্র প্রধান	৪·০০

--ঃ আরো অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ—

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০১৩

ফোন ঃ ২৬-৭৮৫৪

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

ধ্যত্, তখন থেকে খালি গাছপালা, জীব-জন্তু এই সব দেখছিস! ওসব দেখার জন্য তো বাইনোকুলার আছে—
- আর এ হল টেলিস্কোপ, মহাকাশ গবেষণার জন্য। তুই এর ভ্যালু কি বুঝবি।
ঐ গবেষণার বিষয়টা আপাতত স্থগিত রেখে, পৃথিবীর চারদিকটা নজর দিলে আমার মূল্যটা কিছুটা বুঝতে পারতিস
খেলা বকিসনি তো, আমাকে দেখতে দে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে— বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি—
খুদে!
আর এইটা হল শনি—
কেরে? কাকু!
হ্যাঁ, শনিই বটে! আমার দামী টেলিস্কোপটা নিয়ে খেলা হচ্ছে?
এই গ্রহই ওর কাল হল!
এই গ্রহ-শান্তির জন্য ওর একটা কিছু ধারণ করা উচিত ছিল
ঐ কাকু বেরিয়ে গেলেন! চল আবিষ্কারকের হালটা দেখে আসি।
হারামজাদা! আশা করি এতেই ওর শিক্ষা হবে—
ইস্! জানিস তো, লোকেরা এই গ্রহ সন্তুষ্টির জন্য কত রকমের স্টোন পরে, আর তুই স্টোন ছাড়াই গ্রহের পেছনে ছুটছিলি— তাই তো এই দুর্ভোগ
নিকুচি করেছে স্টোনের! নেহাৎ কাকু দেখে ফেললেন, তাই—

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

বরুণ মজুমদার

এশিয়ার বৃহত্তম দূরবীক্ষণ

এশিয়ার সর্ববৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্মাণ শেষ হয়ে এসেছে। 2·36 মিটারের এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি তৈরী হচ্ছে তামিলনাড়ুর কাভাল্যুর মানমন্দিরে। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আকাশের প্রথম তারা দেখতে পাবে। ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সমপরিমান গুণ এই যন্ত্রে পাওয়া যাবে। যে সব মহাকায় তারা অনেক বেশি দূর থেকে আলো পাঠাচ্ছে বা যে সব তারার আলো অত্যন্ত ম্লান এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাও পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

সম্পূর্ণ ভারতীয় নক্সায় এবং কৃৎকৌশলে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অফ অ্যাসট্রোফিজিক্স-এর অধিকর্তা ডঃ জে. সি. ভট্টাচার্য এই তথ্য জানান। এটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় দৃশ্য বস্তুকে এক হাজার গুণ বাড়িয়ে দেখাতে পারবে।

ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলেন যে, টেলিস্কোপ তৈরীর ক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সমমানের কাজ এতে করা হয়েছে। 1976 সালে এই কাজ শুরু হয়। টেলিস্কোপটি বসানোর জন্যে 27 মিটার উঁচু করা হয়েছে স্তম্ভ-মিনারটিকে। পুনের একটি কারখানায় 100 টন ইস্পাতে এর নির্মাণাংশের কাজ করা হ'য়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির পরিধি 1·96 মিটার। জার্মানীতে নির্মিত দূরবীক্ষণ কাচ এতে ব্যবহৃত হয়েছে। যন্ত্রটি কম্পিউটার চালিত।

যন্ত্রমানব

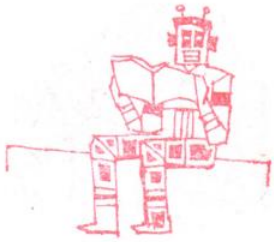

অনেকে বলেন, এটা হলো কম্পিউটরের যুগ। কম্পিউটর যন্ত্র কি না করছে? জাপানে কিছুদিন আগে পাঠিকা কম্পিউটর তৈরী হয়েছে। এর সামনে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজ ধরলে তা পড়ে দেবে এই কমপিউটর। জাপান 1980 সালের মধ্যে এমন কমপিউটর আমাদের উপহার দেবে বলে কথা দিয়েছে, যা প্রায় মানুষের মতো বুদ্ধিসম্পন্ন। এই কমপিউটর যন্ত্র মানুষের সঙ্গে সহজেই আলাপ চালিয়ে যেতে পারবে দৈনন্দিন সাধারণ সব বিষয়ে। মানুষের কথাবার্তা শুনে তার সারাংশ এটা যান্ত্রিক মস্তিষ্কে জমা করে রাখবে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে। পড়ার বিষয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেছে দিতে পারবে। ডাক্তাররা এর সাহায্যে নির্ভুল চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবেন। আইনের কোন্ ধারা অনুসারে মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আইনজীবীদের তা নির্ভুলভাবে বলে দেবে। বড় বড় সংস্থার পরিচালকদের চিন্তাভাবনার কাগজে লিখিত কপি সরবরাহ করবে। টেবিলে রাখা ঐ যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি কথা বললেই নিমেষে সব ঝামেলার ফয়সালা করে দেবে এই কমপিউটর। এটা হবে জাপানের পঞ্চম প্রজন্মের কমপিউটর।

অবশ্য এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পিছিয়ে নেই। সেদেশের টেলিফোন টেলিগ্রাফ কোম্পানী এমন একটা কমপিউটর তৈরী করছে যা মানুষের কথা শুনে সেই মানুষটিকে সনাক্ত করতে পারবে। চিঠিপত্রের জবাবের খসড়া তৈরী করে দেবার কাজেও বড় বড় কোম্পানীর জন্যে সেদেশে কমপিউটর তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে।

140 রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া

সহজ কথায় রসায়ন [নয়]

বহুরূপী মৌল

অমরনাথ রায়

ভাইয়ের নাম 'ডায়মণ্ড', বোনের নাম 'গ্রাফাইট।' একই বৃন্তে ওরা দুটি ফুল। একই মৌল কার্বনের ওরা দুই বিভিন্ন রূপ। কার্বন তাই বহুরূপী মৌল। অনেক রূপ ধারণ করে থাকতে পারে কার্বন। কিন্তু এই প্রবন্ধে তার দুটি রূপের কথাই আমি বলব।

ভাই-বোনে যেমন কিছু কিছু মিল থাকে, তেমনি অমিলও থাকে। ডায়মণ্ড ও গ্রাফাইটে তাই মিল এবং অমিল—দুই-ই দেখা যায়। ডায়মণ্ড অতি কঠিন পদার্থ। প্রকৃতিজাত সব পদার্থের মধ্যে কঠিনতম। ডায়মণ্ডের তাই ভারী গর্ব! ডায়মণ্ড এত কঠিন যে এর দ্বারা পাথর ফুটো করা যায়, কাচকে তো অনায়াসেই কেটে ফেলা যায়। রূপেও কম যায় না ডায়মণ্ড। বিচিত্র নক্‌শায় একে একটু কাট-ছাঁট করে নিতে পারলে এর থেকে বেরোয় চোখ-ঠিকরানো দ্যুতি। ডায়মণ্ডের প্রতি-সরাংক 2·42 এবং আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতাও যথেষ্ট। তাই এর এত চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি। আর দ্যুতি ও কাঠিন্য—এই দুই গুণের জন্যেই গোটা বিশ্বে ডায়মণ্ডের এত নাম, এত কদর।

আমরা ডায়মণ্ডকে আদর করে ডাকি 'হীরা' বলে। আমাদের দেশ ভারতে জন্মেছিল বিশ্ববিখ্যাত অনেক হীরা। গ্রেট মোঘল, কোহিনূর, হোপ, ড্রেসডেন, স্যান্‌সি এদের সবারই জন্ম এই ভারতে। কিন্তু এরা সবাই এখন আর ভারতে নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা বিশ্বে। এদের কেউ স্থান পেয়েছে ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটে, কেউবা স্থান করে নিয়েছে কোনও রাজার রাজসিংহাসনে। দেশ ছেড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে এরা হয়েছে পরবাসী। তবে যে যেখানেই থাকুক না কেন, আছে সুখে গর্বের বস্তু হয়ে আপন আভিজাত্য বজায় রেখে। 'কোহিনূর' হীরার কথাই ধর না কেন। সে তো আর আজকের নয়। কমসে কম পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হীরা। মণি-বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে 1304 খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশের অন্ধ্রপ্রদেশের গোলকুণ্ডার কাছে কিলুর খনি থেকে একে উদ্ধার করা হয়েছিল। জন্মকালে কোহিনূর-এর ওজন ছিল 793 ক্যারাট। তারপর মণি-কারের হাতে পড়ে কাটার পর তার ওজন দাঁড়ায় 191 ক্যারাটে। 'কুলিনান' বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরা। খনি থেকে কুলিনানকে যখন তুলে আনা হয়, তখন তার ওজন ছিল 3024 ক্যারাট। দ্যুতি আনবার জন্যে কাটাকুটির পর এখন তার ওজন দাঁড়িয়েছে 317 ক্যারাটে। আজ পর্যন্ত খনি থেকে পাওয়া সব হীরার মধ্যে না কাটা অবস্থায় কুলিনানই সবচেয়ে বড়। খনিজ হীরা দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ও ভারতের গোলকুণ্ডায় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম পাথরে, বালিতে এবং পেরিডোটাইট, কিমবারলাইট ইত্যাদি আগ্নেয়শিলায় হীরা পাওয়া যায়। বেশির ভাগ হীরার সন্ধান মিলেছে নদীর পলিতে, যা এসেছে হীরাবাহী আগ্নেয় পাথর থেকে। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের পান্না অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে হীরা মজুত আছে। প্রতি বছরই ভারতের ভূগর্ভ থেকে বেশ কয়েক হাজার ক্যারাট হীরা উদ্ধার করা হয়। এখানে 'ক্যারাট' কথাটির মানে বলে রাখা দরকার। দামী দামী রত্ন বা মণি পাথরের ওজনকে 'ক্যারাট' এককে প্রকাশ করা হয়। এক ক্যারাট = 0·20 গ্র্যাম। 'ক্যারবিন' নামক ক্ষুদ্র বাটখারা থেকে 'ক্যারাট' নামটি এসেছে।

খনি থেকে তোলা সব হীরাই সব কাজে লাগে না। স্বচ্ছ ভাল জাতের হীরাগুলিকে কেটে রত্ন পাথর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর অস্বচ্ছ ও ঈষৎ রঙিন দাগওলা নিকৃষ্ট শ্রেণীর হীরাগুলিকে ব্যবহার করা হয় শিল্পের প্রেয়াজনে—ড্রিলিং যন্ত্রে, নয়তো কাচ কাটার কাজে।

খাঁটি হীরা কিন্তু বিশুদ্ধ কার্বন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং কার্বনের এটি কেলাসিত রূপ। হীরাকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায়, তবে তাতে খরচ খুব বেশি পড়ে এবং তা প্রকৃতিজাত হীরার মতো অত গুণ-সম্পন্নও হয় না। হীরা আসল না নকল, তা চিনবার একটা সহজ উপায় আছে। আসল হীরার মধ্যে দিয়ে এক্সরশ্মি অতি সহজেই অতিক্রম করে যেতে পারে, কিন্তু কৃত্রিম বা নকল হীরার মধ্যে দিয়ে এক্স রশ্মি অতিক্রম করতেই পারে না। কাজেই এক্স রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে আসল ও নকল হীরাকে সহজেই চেনা যায়।

ভাইয়ের কথা শেষ হলো। এবার আসা যাক বোনের কথায়। বোন 'গ্রাফাইট' ভারী মোলায়েম। এর গায়ে হাত বোলালে বেশ একটা পিচ্ছিল অনুভূতি জাগে।

তবে হ্যাঁ, ভাই ডায়মণ্ডের মতো বোনের কিন্তু রূপ নেই। বোনের রং ময়লা, ধূসর বলা চলে। ভাই ডায়মণ্ডের মতো কাঠিন্য এর নেই। বেশ নরম পদার্থ গ্রাফাইট। ছুরি দিয়ে এর গা কেটে বা চেঁচে ফেলা যায়। আর হাতুড়ি দিয়ে পেটালে মোলায়েম গুঁড়োয় পরিণত হয়।

নাই বা থাকলো রূপ। গুণ কিন্তু গ্রাফাইটের কম নয়। হীরা তাপ ও বিদ্যুতের অপরিবাহী এবং রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হলেও গ্রাফাইট কিন্তু তা নয়। এ তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী। অধাতু হলেও গ্রাফাইট বেশ উজ্জ্বল। এর নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'grapho' থেকে। grapho' কথার অর্থ হলো 'আমি লিখি'। সাদা কাগজে কালচে বা ধূসর রঙের দাগ কাটতে পারে বলেই এর এমন নাম হয়েছে। পেনসিলের সীস গ্রাফাইট দিয়েই তৈরি হয়। এ ভিন্ন তাপ সহনশীল ধাতু গলানোর পাত্র এবং বৈদ্যুতিক চুল্লীর তড়িৎদ্বার তৈরি হয় গ্রাফাইট দিয়ে। গ্রাফাইট চূর্ণ কঠিন লুব্রিক্যাণ্ট অর্থাৎ কিনা পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়। হীরার কেলাস ঘনকাকার, কিন্তু গ্রাফাইটের কেলাস সুষম ষড়ভূজাকার। কতকগুলি বিভিন্ন সমতলীয় কার্বন পরমাণুর স্তর দিয়ে গঠিত হয় গ্রাফাইটের কেলাস। এর কেলাসের ওপর তির্যকভাবে চাপ দিলে উপরের স্তরটি নিচের স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে যেতে পারে বলে গ্রাফাইট পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ ভিন্ন গ্রাফাইটের কেলাসে কার্বনের পরমাণুগুলির পারস্পরিক বন্ধন বিভিন্ন স্তরে বেশ আলগা অবস্থায় থাকে। গ্রাফাইট তাই নরম। হীরার মতো গ্রাফাইটও খনিজ পদার্থ, পাওয়া যায় সিংহল, সাইবেরিয়া, ইটালী ও যুক্তরাষ্ট্রে। আজকাল অবশ্য কৃত্রিম উপায়েও গ্রাফাইটকে তৈরি করে নেওয়া যায়।

প্রকৃতিতে গ্রাফাইটকে পাওয়া যায় হরেক রকমের পাথরে, বিশেষ ক'রে রূপান্তরিত শিলার জঠরে। আমাদের দেশের উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে তিন-চারশো বছরের পুরনো খনডালাইট পাথরের ভেতরে গ্রাফাইটের সন্ধান মিলেছে।

আমাদের দেশে গ্রাফাইটের চাহিদা প্রচুর, অথচ উৎকৃষ্ট মানের গ্রাফাইট আছে কম। তাই বিদেশ থেকে এই খনিজ পদার্থটি আমাদের আমদানী করতে হয়।

কার্বনের দুটি বিভিন্ন রূপভেদ হীরক ও গ্রাফাইটএর কথা তো শুনলে। যে ধর্মের জন্যে একই মৌল এমনি বিভিন্ন রূপ ধারণ ক'রে থাকতে পারে, রসায়ন বিজ্ঞানে সেই ধর্মকে বলা হয় বহুরূপতা। এই বহুরূপতা ধর্ম আছে গন্ধকের ও ফসফরাসের।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

ভাবনা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

সবাক্ চলচ্চিত্র

1900 সালেরও আগে ফ্রান্সের লিওঁ গ্যাও মোঁ প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই চিত্রগুলি ছিল অল্প দৈর্ঘ্যের এবং সারা বার্নহার্ডট্-এর মতো বড় বড় শিল্পীর অভিনয় সমৃদ্ধ। এগুলিতে গতিশীল চিত্রমালার সঙ্গে গ্রামাফোন রেকর্ডের সমন্বয় ঘটিয়ে প্রদর্শিত চরিত্রগুলির কথাবার্তা ও চলাফেরা পর্দার উপর উপস্থাপিত করা হত। 1912 সালে ইউজিন লাউসে ফিল্ম্-এর উপর শব্দের অভিলেখ প্রস্তুত করার মূল পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে টমাস এডিসন্ কয়েকটি এক-রীল দৈর্ঘ্যের সবাক্ চিত্র প্রস্তুত করেন। লি ডি ফরেস্ট নামে জনৈক আমেরিকান চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করেন।

এসব সত্ত্বেও 1927 সালের 6 অক্টোবর 'দি জাজ সিংগার' নামে ছবিটি দেখানোর আগে পর্যন্ত জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নি। ছবিটিতে কথাবার্তা ছিল খুব অল্প। আল্ জল্সন্ এই ছবিতে অভিনয় করে তারকার মর্যাদা লাভ করেন। ছবিটিতে কথোপকথন ও সঙ্গীতপূর্ণ চারটি মধ্যাংশ ছিল। জল্সন্-এর রোমাঞ্চকর ব্যক্তিত্ব এবং অতি উন্নত শব্দব্যবস্থা চলচ্চিত্র জগতে বিপ্লব ঘটালো। বছরখানেকের মধ্যে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ছবি সবাক্ চিত্র হিসাবে নির্মিত হতে লাগলো। 1930 সাল নাগাদ নির্বাক্ চিত্র অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো এবং অভিলিখিত কণ্ঠস্বর বাজে শোনানোর জন্যে বহু চিত্রতারকা বাতিল হয়ে গেলেন।

6সি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-4

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

ব্রেন কন্ট্রোল

সুকুমার ভট্টাচার্য

মাথার ওপর ঘুরতে থাকা পাখাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সাব-ইনস্‌পেক্টর মিঃ পাটোয়ারি বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন, ভবতোষবাবু খুন করেন নি?

—না, সে কথা আমি একবারো বলি নি। মহাজন জবাব করলেন, তা ছাড়া আমার বলাবলিতে কি আসে যায়? সে মানুষ নিজেই স্বীকার করেছেন, বিকাশ মিত্তিরকে তিনি গলা টিপে হত্যা করেছেন। কিন্তু—

—এর পরে আর কিন্তু কি স্যার! আমরা পুলিশের লোক, অপরাধীর স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া আছে প্রত্যক্ষদর্শীর স্টেটমেণ্ট। এর পরেও যদি অন্য কিছু প্রসঙ্গ এনে ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলেন, তা হলে আইনগত দিক থেকে আদালত আর নিজেদের বিব্রত করা হয় না কি?

স্পষ্ট অভিযোগ। হাজার হলেও অফিসার ইনচার্জ। মহাজনের মুখে বিরক্তি দেখা দিল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ পাটোয়ারি, হঠাৎ আমার ওপর আপনার আস্থা এত কমে যাওয়ার কারণ কি?

সঙ্গে সঙ্গে থুতনিটা কণ্ঠার কাছে নেমে এলো মিঃ পাটোয়ারির, আমায় মাফ করবেন, আমি সের'ম কিছু ভেবে কথাটা বলি নি। তা হলে আপনার কথাই রইল, আজ সন্ধ্যায় ডঃ অবিনাশ মিত্তিরের বাড়িতে আমি হাজির থাকছি।

—হ্যাঁ। বমাল সমেত। সহজ হাসি আবার দেখা দিল মহাজনের মুখে, যদিও আপনার আগে আমিও সেখানে হাজির থাকবো।

উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পাটোয়ারি, বমাল সমেত! ঠিক বুঝলাম না স্যার।

—আরে বসুন, বসুন। আমাদের ঝামেলা তো সেই সন্ধ্যেয়।

মিঃ পাটোয়ারির কথার জবাব দিলেন না মহাজন। পাটোয়ারি চেয়ার নিতে মুখ খুললেন তিনি, আচ্ছা, ভবতোষকে আপনি তো বেশ ভালভাবেই দেখেছেন, ফ্রম দ্য কোর অফ ইয়োর হার্ট বলুন তো, সে কি সত্যিই বিকাশ মিত্তিরকে গলা টিপে মারার ক্ষমতা রাখে? দেহ কিম্বা মনের দিক থেকে সত্যিই সে কি এতটা সবল?

একটু সময় নিলেন মিঃ পাটোয়ারি। চোখের ওপর ভেসে উঠল ভবতোষবাবুর ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুর দম মার্কা চেহারা। চোয়াল বসা, কোটরাগত দু'টো চোখ।

—কিন্তু স্যর—

—কিন্তুর কথা তো আগেই বলেছেন। ভবতোষবাবু যে খুন করেছেন এটা ঠিকই। তবে কেন, কিজন্যে তিনি এমন কাজ করলেন, সেগুলো খুঁটিয়ে ভেবে দেখেছেন কি? পুরনো কোন রাগ বা দ্বেষ মনে থাকলে, কিম্বা ধরুন বিকাশ মিত্তিরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলে নিজে বেনিফিটেড হবার আশা যদি কিছু থাকে, তবেই না সে মানুষটা অমন বাজে কাজে ঝুঁকি নেবেন?

অস্বীকার করবার উপায় নেই মিঃ পাটোয়ারির।

—বেশ, মহাজন বললেন, এখন বিকাশ মিত্তিরকে খুন করে, ভবতোষবাবু কতটা বেনিফিটেড হতে পারেন খতিয়ে দেখা যাক। ভবতোষবাবুর বাবারা হলেন তিন ভাই। বড় বিকাশবাবু, কোন ছেলেপুলে নেই। খুন হবার পর তাঁর তরফে আছেন শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী। মেজকর্তা মহীতোষ মিত্তির, বেশ কয়েক বছর আগে সস্ত্রীক গত হয়েছেন। তাঁরই একমাত্র রুগ্ন সন্তান হলেন ভবতোষ মিত্তির। ও বাড়ির ছোট কত্তা, ডঃ অবিনাশ মিত্তির। এবার বিচারে বসা যাক। ওয়ারিশনের দিক থেকে আমরা তিনটে খুঁটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিকাশবাবু, ভবতোষ, আর ডঃ অবিনাশ মিত্তির। বাড়ির বহুকালের পুরনো চাকর শশী পুলিশের কাছে বলেছে, সে নিজের চোখে ভবতোষবাবুকে দেখেছে, বিকাশবাবুকে গলা টিপে মারতে। তখন মাঝরাত্তির। বড়বাবুর ঘরের বাইরের দালানেই সে শুত। আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভাঙতেই সে ঘটনাটা দেখে। বেশ—

একটু থামলেন মহাজন, রহস্যময় চোখে তাকালেন মিঃ পাটোয়ারির দিকে, তা হলে দেখা যাচ্ছে, তিনটি খুঁটির একটি গেল অপঘাতে, আর একটি যেতে বসল অপরাধে। এখন বলুন, এবার আইনআদালত পর্বগুলো যদি যথাযথ চলে, আলটিমেট বেনিফিটেড হবে কে? জবাব দিন।

—ডঃ অবিনাশ মিত্তির। কিন্তু তাঁর মতো মানুষ—

—এগ্‌জ্যাক্টলি, তাঁর মতো মানুষ। এবার তা হলে দেখা যাক, তিনি কেমন মানুষ? ডঃ অবিনাশ মিত্তির, একজন মনের রোগের ডাক্তার। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ভিয়েনার ইউনিভার্সিটি ঘুরে, অনেক বড় বড় খেতাব নিয়ে কলকাতায় ফিরে চেম্বার আর নার্সিংহোম খুলেছেন। আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির হেন সরঞ্জাম নেই, যার অভাব আছে তাঁর ভাণ্ডারে। কলকাতায় তাঁর সুনাম প্রচুর এবং ভারতে তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি একটা কিম্বদন্তী। আশা করি এতদূর পর্যন্ত আমি কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলি নি। কি মিঃ পাটোয়ারি?

—না।

—বেশ, তা হলে এতদূর পর্যন্ত সকলেরই জানা। কিন্তু মনের খবর কে জানতে পারে? আলোর নিচে যেমন অন্ধকার, খ্যাতির পেছনেও তেমনি থাকে আরো পাবার ঈপ্সা। আমার মতে সেটা অন্ধকারেরই সামিল। সেই অন্ধকারের খবর কে জানতে পারে?

—আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন? মিঃ পাটোয়ারি যথেষ্ট বিভ্রান্ত।

—আমি বলতে চাইছি, ভবতোষ মিত্তিরকে পাকা-পাকিভাবে অভিযুক্ত করার আগে, সমস্ত দিক ভালভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। আমার নীতি আপনি জানেন, সব রকম দিক বিবেচনা করে স্থিরনিশ্চিত হয়েই আমি চার্জশীট তৈরি করি। ভবতোষবাবুর ব্যাপারে আমি এখনো সে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। দেখা যাক, সন্ধ্যে পর্যন্ত ডেভ্‌লপমেণ্ট কতদূর এগোয়।

বলছেন কি?

—হ্যাঁ। আর আপনার কাছে আমার অনুরোধ, এসব নিয়ে আজ রাত পর্যন্ত কারো কাছে মুখ খুলবেন না।

—হঠাৎ এর'ম কথা! কিছুটা ক্ষুণ্ণ মিঃ পাটোয়ারি।

হাসলেন মহাজন, যদিও সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট নিশ্চিন্ত। তবু বললাম, কারণ অধিকন্তু ন দোষায়। আমি একটা মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার ইন্‌ফরমার নিত্যানন্দকে নিশ্চয় মনে আছে আপনার, সে তার পাত্তা করেছে। শুধু কায়দা করে তুলে এনে, আপনার জিম্মায় করে দিতে পারলেই হয়। আর সে সেটা পারবেই। অতএব আজ সন্ধ্যায়, ডঃ অবিনাশ মিত্তিরের চেম্বারেই মোস্ট প্রব্যাবলি আমি আপনাদের কাছে বিশদ হতে পারব।

—বুঝলাম।

—তবে হ্যাঁ, তার আগে ইচ্ছে করলে আপনি জেল হাজতে গিয়ে, ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে পারেন। এমনো হতে পারে, আমরা আরো নতুন কিছু সূত্র পেতে পারি।

—বেশ। আমি সে চেষ্টাই করছি।

মিঃ পাটোয়ারি যখন জেল হাজতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখনো তিনের ঘরে ছোট কাঁটা গিয়ে পৌঁছয় নি। সিপাহী গরাদের কাছ বরাবর এসে ফিরে গেল। মিঃ পাটোয়ারি দু'চারটে এটাওটা কথার পর, একেবারে কাজের কথায় চলে গেলেন। অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, ভবতোষবাবু, একটা

কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না, জবাব দিতে পারেন ?

মুখ তুললেন ভবতোষ।

—হাজার হলেও বিকাশবাবু আপনার জ্যাঠামণি। কি এমন অপরাধ তাঁর, যার জন্যে তাঁর ওপর আপনি ওভাবে চড়াও হলেন ?

একটা ভাবলেশহীন চাউনি ফুটে উঠল ভবতোষবাবুর চোখে। কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অনুশোচনা মাখা গলায় তিনি বললেন, আমারো মাথায় ঢোকে না। হঠাৎ কেনই বা আমি এ কাজ করলাম। মাঝে মাঝে খিটিমিটি, কথা কাটাকাটি কখনো হয় নি জ্যাঠামণির সঙ্গে এমন হয়, তা বলে অমন ঘটনা আমার হাত দিয়ে হয়ে যাবে, আমি কখনো ভাবি নি।

চুপ হলেন ভবতোষ। মিঃ পাটোয়ারি এগিয়ে চললেন, তা হলে বিকাশবাবুর সঙ্গে আপনার খিটিমিটি ছিল ? কিন্তু কি নিয়ে ? অবশ্য যদি বলতে কোন বাধা না থাকে।

—না, বাধা কিসের ? একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন ভবতোষ, তবে সে সব ব্যাপারের পর অনেক দিন কেটে গেছে। আমার মনেও কোন রাগদ্বেষ ছিল না।

—তবু, ঘটনাটা কিরকম ?

—কাকামণি চেয়েছিলেন, বাড়ির পিছনের বাগানের জায়গাটায় একটা নতুন বাড়ি তুলতে। নার্সিং হোম করবেন বলে।

—কাকামণি, অর্থাৎ ডঃ অবিনাশ মিত্তির ? কোন ফাঁক রাখতে চান না মিঃ পাটোয়ারি।

—হ্যাঁ। বাড়িটা যখন ভাগ হয়, কাকামণি ডাক্তার মানুষ বলে সামনের অংশটা ওনাকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে পিছনের বাগানটা আমার বাবা আর জ্যাঠামণির ভাগে বর্তায়। বাবা নেই, কাকামণি আমার কাছে প্রস্তাব দিলে, আমি রাজি হই। কিন্তু জ্যাঠামণি কিছুতেই রাজি নন, বাড়ির পিছনটাকে অমন পাগলাগারদ করে তুলতে।

মিঃ পাটোয়ারি কিছুটা আলোর দেখা পেলেন। মনে পড়ল মহাজনের কথা।

—ঠিক কথা, বাড়ির লাগোয়া পাগলাগারদ তৈরি হোক, এ খুব কম লোকই পছন্দ করেন। কিন্তু আপনি কাকামণির কথায় রাজি হয়েছিলেন কেন, ভয়ে ?

—না-না। ভয় কিসের ? ভয় দেখিয়ে কিছু করার মানুষ উনি নন। তা ছাড়া, আমায় উনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন চেহারা। চিরকালই রুগ্ন। ছোটবেলায় রিকেট হয়েছিল, তারপর এত বছর বয়েস পর্যন্ত কখনো ভাল থাকি নি। কাকামণির জন্যেই তবু কিছুটা সুস্থ থাকি।

—তা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল, নার্সিং হোম করার ?

—কিছুই না। কাকামণি প্রথম কিছুদিন খুব রাগ করেছিলেন। পরে বললেন, কি আর করা যাবে, দাদার যখন ইচ্ছে নেই, তখন ও প্ল্যানিংটা বন্ধই করে দিলাম রে। তা এসব বছর দুতিন আগেকার কথা। সেই সময় জ্যাঠামণির সঙ্গে দু-একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

—ও। একটু থেমে আবার মিঃ পাটোয়ারি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, যেদিন রাত্রে আপনি বিকাশবাবুর ওপর চড়াও হন, সেদিন সন্ধ্যায় আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বা কি করেছিলেন কিছু মনে আছে ?

হাসলেন ভবতোষ, না থাকার কি আছে ? সাধারণত এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়তে আমার কখনো ভাল লাগে না। তাই সন্ধ্যেবেলাটা চিরকালই কাকামণির চেম্বারেই থাকি। রাত্তিরে কাকামণি যখন ওপরে উঠে যান, আমিও তাঁর সঙ্গে উঠে যাই।

উঠে পড়লেন পাটোয়ারি। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজিত। জেল অফিস থেকেই টেলিফোন করলেন মহাজনকে, ঈপ্সার অন্ধকার কিছুটা নজরে পড়েছে। কিন্তু ভবতোষবাবুর রেহাই কোথায় ? তিনি তো এখনো পর্যন্ত নিজের অপরাধ কবুল করছেন।

রিসিভারে মহাজনের জবাব শুনতে পেলেন তিনি, কাউকে রেহাই কিম্বা ঝুলিয়ে দেওয়ার ভার তো আমাদের ওপর নেই মিঃ পাটোয়ারি। সে ভার আদালতের। আমরা পুলিশ, প্রকৃত অপরাধীকে বিচারকের সামনে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।

খবর পাঠিয়ে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ডঃ মিত্তির তাঁর ক্লোজড্ চেম্বার থেকে মুখ বাড়ালেন, আপনাকে কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে। বুঝতেই পারছেন।

—না-না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়েটিংরুমের অপেক্ষমান মানুষগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহাজন বললেন, হাতের কাজ সারুন। আজ আবার আমাদের একটু বেশি সময় দিতে হবে।

—তাই নাকি! আ-চ্ছা।

ডঃ মিত্তিরের মুখ দরজার আড়ালে চলে গেল। বসে আছেন মহাজন। আশপাশের অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ তাঁর ওপর। সেণ্টার টেবিলের ওপর থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। ঠিক তার পরেই নিত্যানন্দ ঘরে ঢুকল। মহাজনের পাশের সোফাটায় বসে ফিস ফিস করে উঠল, মিঃ পাটোয়ারি এসে গেছেন।

—আমার এক নম্বরকে আনা হয়েছে তো ?

—হ্যাঁ। পাটোয়ারির জিম্মায়। কিন্তু দু-নম্বরকে আনা সম্ভব হলো না।

—কেন ? অপ্রসন্ন মহাজন।

—যাই বলুন, আনা সম্ভব নয়। একেবারে বেহাল। হাঁপানির টান এত বেড়েছে যে আনলে আমরাই বিপদে পড়ব। তবে আমাদের যাতে অসুবিধে না হয়, সমস্ত পয়েন্টের ওপর তিনি বিরাট নোট দিয়েছেন, আপনাকে দেবার জন্যে। বলেছেন—এখন এতেই কাজ হবে। পরে উনি তো আছেনই।

—হুঁ। গম্ভীর হলেন মহাজন।

এক এক করে ঘর ফাঁকা হতে অনেকটা সময় নিল। এক সময় ডঃ অবিনাশ মিত্তির বেরিয়ে এলেন তাঁর ক্লোজড ডোর চেম্বার থেকে, আর ভালো লাগে না। নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন। ইনি কে ?

সোজা চোখ গিয়ে পড়ল নিত্যানন্দর ওপর। মহাজন বললেন, আমার সহকারী বলতে পারেন। তারপর কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন, কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমরা বেশ ধোঁকায় পড়ে গেছি বলতে পারেন। যে কারণে আপনার কাছে ছুটে আসতে হল।

—সেটা বুঝতেই পেরেছি। ডঃ মিত্তির সোফায় এলিয়ে দিলেন নিজেকে, ভবতোষের কথা মনে হলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ওর জন্যে আমি যথেষ্ট সময় দিতে পারি। আপনি আরম্ভ করুন।

—আশ্বস্ত হলাম। নড়েচড়ে বসলেন মহাজন, আপনাদের বহুদিনের পুরনো চাকর শশীর স্টেটমেণ্ট আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে।

—শশীর স্টেটমেণ্ট ! কিরকম ?

—শশী বলেছে, ভবতোষবাবু বিকাশ মিত্তিরকে গলা টিপে হত্যা করেছেন, সে সেটা নিজের চোখে দেখেছে।

—হ্যাঁ, সেটা আমি জানি এবং ভবতোষের বিরুদ্ধে ওটা মারাত্মক।

—হ্যাঁ। কিন্তু তার থেকেও মারাত্মক, তার পরের মন্তব্য। সেগুলোর ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করে যদি চার্জশীট তৈরি করা যায়, তা হলে হয়তো ভবতোষবাবুর গুরুদণ্ড কিছুটা কমতে পারে।

—তাই নাকি ? বহুদিনের পুরনো লোক তো ? বলুন, একটা ভাল কাজ করেছে ? বলে সোজা হয়ে বসলেন ডঃ মিত্তির।

—হ্যাঁ, ও বলেছে—মহাজন তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। শশীর মন্তব্য—ভবতোষবাবুকে সে জন্ম ইস্তক দেখে আসছে, কিন্তু কখনো তাঁকে সে রাগতে দেখে নি। গলা টিপে হত্যা করা তো অনেক দূরের কথা। একটা মানুষের রেগে উঠতে শরীরে যে ক্ষমতা থাকা দরকার, ভবতোষবাবুর সে শক্তিই শরীরে ছিল না কোন দিন।

—বাজে কথা। ক্ষীণজীবী দুর্বল মানুষই বরং যত কাণ্ড করে বসে রেগে গিয়ে। প্রতিবাদ করলেন ডঃ মিত্তির।

—ঠিক। মহাজনের যুক্তি, রাগতে পারে, কিন্তু শরীরে প্রতিকার করার ক্ষমতার অভাবে ভেতরে ভেতরে গর্জায়। আর যদিও বা বেপরোয়া হয়, তা হলে পিছন থেকে, কিম্বা লোক লাগিয়ে সে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে। গলা টিপে মারার দৈহিক ক্ষমতা সে মানুষের আসবে কোথা থেকে ?

—পার্টলি মেনে নিচ্ছি, এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য কি ?

শশী বলেছে, মহাজন এগিয়ে চললেন, ছোটবেলায় দারুন রিকেটে ভোগেন ভবতোষবাবু, আপনি তাঁকে সুস্থ করেছেন। পর পর বার তিনেক টাইফয়েড হয় বছর সাতেকের মধ্যে, তাও আপনি ভাল করেছেন।

—করেছি।

—তারপর থেকে আজ পর্যন্ত উনি আপনার চিকিৎসাতেই দাঁড়িয়ে আছেন।

—আছে।

—এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, একজন মানুষকে খুন করার মতো দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা তাঁর এলো কোথা হতে ?

—স্ট্রেঞ্জ ! ডঃ মিত্তিরের চোখে বিস্ময়, আমি মনের রোগের ডাক্তার ঠিকই, কিন্তু কার-কোথায়-কখন চিত্ত বিকলন হচ্ছে এবং কি কারণে, তার ডিটেকশন কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

—অন্ততঃ আপনার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব। বাম দিকে হেলে পড়ে তির্যক চোখে তাকালেন মহাজন। পুলিশের সদর দপ্তর ভবতোষবাবুর মেডিক্যাল চেক আপ করে কিন্তু অন্য রিপোর্ট দিচ্ছে।

—যেমন ?

—দেখা গেছে, ভূমিকম্পের আলোড়নের মতো ভবতোষ-বাবুর মগজে একটা আক্রমণাত্মক সেনসেশন মাথা চাড়া দিয়েছিল সেই সময়।

—স্বাভাবিক ! না হলে গলা টিপতে যাবে কেন সে ?

সমর্থন করলেন ডঃ মিত্তির।

—কিন্তু অস্বাভাবিক হলো, রিপোর্টে বলছে দ্যাট ইজ ক্রিয়েটেড বাই সামবডি এলস।

—ইজ ইট পসিবল? আকাশ থেকে পড়লেন ডঃ মিত্তির।

—পসিবল। আমাদের বিজ্ঞান বিভাগ ভরতোষবাবুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছে, সেটা হলো, ভবতোষ বাবুর মস্তিষ্কের কেন্দ্রের ধূসর স্নায়ুকোষ সমষ্টিতে, আই মীন, সেনট্রাল গ্রে পোরশনে তড়িৎ-প্রবাহ সংক্রামিত করে তাকে উত্তেজিত করা হয়েছিল।

মহাজন দেখলেন, অবাক বিস্ময়ে ডঃ মিত্তিরের চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন, আপনাদের পুলিশেও বিজ্ঞান বিভাগ শেষ পর্যন্ত ভবতোষ সম্বন্ধে ওই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে! খুব ভাল, একেই বলে এ্যাবসার্ড ইমাজিনেশন। আর কি কি বলেছে জানতে পারি?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। উঠে দাঁড়ালেন মহাজন। কিছুক্ষণ আগে নিত্যানন্দর দেওয়া কাগজটা প্যান্টের পকেট থেকে বার করে একবার ঝালিয়ে নিলেন। এতে বলা হয়েছে, যে কোন ঠাণ্ডা মাথার মানুষকে উত্তেজিত করে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিজের উদ্দেশ্য সফলের কাজ লাগাতে পারেন। যদিও আমাদের দেশে এমন ঘটনা বিরল, কিন্তু অসম্ভব নয়। আর এরকম যে করা যায়, তার রেফরেন্সে বলা হয়েছে, বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেস 1932 সালে এটা পরীক্ষা করে দেখিয়ে গেছেন। তিনি প্রমাণ করে গেছেন, মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ধূসর স্নায়ুকোষ সমষ্টিতে অর্থাৎ সেনট্রাল গ্রে ম্যাটারকে রেডিও মারফৎ উত্তেজিত করে যে কোন ঠাণ্ডা স্বভাবকেও আক্রমণাত্মক করে তোলা যেতে পারে।

ডঃ মিত্তিরের চোখ দুটো কুঁচকে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মহাজনের মুখের দিকে। মহাজন বলে চললেন, তেমনি আবার স্বভাব-রাগী সবলের মস্তিষ্কের caudate nucleus জায়গাটাতে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে সে মানুষকে ঠাণ্ডা নিরীহও বানিয়ে দেওয়া সম্ভব। ভবতোষ বাবুর মেডিকেল চেক আপ রিপোর্ট বলছে—

—আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, কে এ কাজ করতে পারে?

—আপনি।

—আমি! বাট হোয়াই? চিৎকার করে উঠলেন ডঃ মিত্তির।

—শুধুমাত্র এক কাজে দুটি মানুষকে সরিয়ে আপনাদের বাড়ির পেছনের বাগানটার অধিকার পাবার স্বার্থে।

—আপনি। আমি! বাট হোয়াই?

—অ-ফি-সা-র ?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মহাজন। ঈঙ্গিত পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিত্যানন্দ। মহাজন হাত কয়েক দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ডঃ মিত্তিরের মুখোমুখি, আমার কাছে খবর আছে অবনী ঘোষাল, আপনার এসট্যাব্‌লিশ-মেণ্টের একজন সীনিয়র অ্যাসিসট্যাণ্ট, আজ প্রায় একুশ দিন হলো ডিউটিতে টার্ন-আপ করছেন না। তাঁর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কোন কৈফিয়ৎ আপনার জানা আছে কি ?

—সেটা কি সম্ভব ! একটা লোক কেন আসছেন না।

—নিশ্চয় সম্ভব। কথাটার খেই ধরে নিলেন মহাজন, কারণ আপনিই যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন সেটা অস্বীকার করতে চাইছেন। ভবতোষবাবুর মস্তিষ্কে তড়িৎ-প্রবাহ দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই ছিলেন আপনার একমাত্র সহকারী।

—তার মানে ! উঠে দাঁড়ালেন ডঃ মিত্তির।

—আপনার বোধ হয় জানা নেই ডঃ মিত্তির, অবনী-বাবুকে বোম্বেতে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয়েছে। এবং এই মুহূর্তে তিনি আপনার চেম্বারের বাইরে, এখানে আসার অপেক্ষায় আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল ডঃ মিত্তিরের। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। গলার টাইটা আলগা করতে করতে ধপ্ করে বসে পড়লেন। তার পরেই দেখা গেল, একদিকে মিঃ পাটোয়ারি, অন্যদিকে নিত্যানন্দ অবনী ঘোষাল ঘরে ঢুকছেন।

হুগলী ইংক কোম্পানী লিঃ, 10 ওয়ালেস রোড, লিলুয়া।

সমাধানের সমীকরণ সহজ পদ্ধতি

নন্দলাল মাইতি

বাবা অশোক,

তুমি গবেষণা নিয়ে খুব ব্যস্ত জানি। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সময় করে একবার এসো। রফি কী কাণ্ড করছে দেখে যাও!

স্নেহ ও আশীর্বাদ জেনো।

চাচী।

ছোট্ট চিঠিটা পেয়ে অশোক একটু আশ্চর্য হলো। রফি এমন কি কাণ্ড করছে! মোশারফের সঙ্গে গতকাল দেখা হয়েছিল। সে তো কিছু বললো না তেমন! যাই হোক, বিশেষ কৌতূহল নিয়ে সে রফিদের বাড়ি এলো।

চাচী যেন অশোকের জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন। বললেন,—এসো বাবা, তোমায় একটু ব্যস্ত করলাম তো?

অশোক সহাস্যে বললো—না-না, মোটেই ব্যস্ত করেন নি আপনি। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

—ঘরে এসো, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

ঘরের দরজা থেকেই চাচী বললেন—রফি দ্যাখ কে এসেছে!

রফি টেবিলের ওপর ঝুঁকে একমনে কি যেন করছিল। মুখ তুলে অশোককে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—জানি, তুমি ডেকেছ বলে অশোকদা এলো, অথচ আমি দু-দিন

—আরে পাগল, আমি যে তখন বাড়ি ছিলাম না। একটা সেমিনারে যোগ দিতে দিল্লী গেছলাম। এই তো গতকাল ফিরেছি। হ্যাঁ রে, রফি, এসব কি?

রফি॥ এসব বিজ্ঞান পত্রিকা।

অশোক॥ তুই কি আগে বিজ্ঞান পত্রিকা পড়তিস?

রফি॥ না, আগে নয়। এখন পড়ি। খু-ব ভাল লাগছে!

অশোক॥ কেবল ভাল লাগছে বললে হবে না। এতে তোর কি লাভ হচ্ছে বল।

রফি॥ আমি হয়তো ভালো করে বলতে পারব না, অশোকদা। তবে সত্যি আমার ভাল লাগছে। আমাদের পড়ার বই-এর বাইরে অনেক কথা জানতে পারছি। আর পড়ার বই থেকে যা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, তা এইসব পত্রিকা থেকে আরো ভালো করে বুঝতে পারছি।

অশোক॥ আর অঙ্ক?

—অঙ্ক তো ওকে পাগল করে করেছে, বাবা! সেই যে তুমি কি মন্ত্র দিয়ে গেলে, তারপর থেকে কেবল অঙ্ক কষছে।

গরম চায়ের প্লেটটা হাতে নিয়ে অশোক বললো—না চাচী, আমি কিছুমাত্র মন্ত্র দিই নি। আসলে রফিকের বোধ হয় খুব ভাল লেগেছে।

রফি॥ আজ আর তোমায় ছাড়ছি না অশোকদা।

চাচী॥ না রফি, আজ আর অশোককে কিছু বলিস না। আমি আজ ওকে ডেকেছি অন্য কারণে। বাবা অশোক, তুমি রফির সঙ্গে গল্প কর, আর আজ রাত্রে চাচীর রান্না খেয়ে যেও।

অশোক॥ চাচী—না, চাচী……চাচী

রফি॥ মা কোন কথা শুনবে না, অশোকদা। আমায় দু-দিন পাঠিয়েছিল। তার চেয়ে—

অশোক॥ তোর অঙ্ক নিয়ে ততক্ষণ আলোচনা করা যাক।

রফি॥ ঠিক তা-ই বলছিলাম। সেদিন তুমি সহজ ধরনের সমীকরণ সমাধানের কথা বলেছিলে। আমি সে-পদ্ধতিতে অনেক অঙ্ক কষেছি। আজ একটু জটিল ধরনের সমীকরণ দিয়ে……

অশোক॥ জটিল বলছিস কেন? বল, ছদ্মবেশী সমীকরণ?

রফি॥ ছদ্মবেশী সমীকরণ? সে আবার কি, অশোকদা?

অশোক॥ আরে, যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমা দেখিস নি। ওইসব দাড়ি-গোঁফ-মুখোস ইত্যাদি পরে যখন আসল চেহারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন তাকে ছদ্মবেশ বলে।

রফি॥ ওঃ, তাই বল। কিন্তু আমরা ধরে ফেলি।

অশোক। কিন্তু অঙ্কের বেলায় ধরতে পার না কেন?

রফি॥ অঙ্কে আবার ছদ্মবেশ কোথায়?

অশোক॥ ওই যে যাকে তোমরা কঠিন, জটিল অঙ্ক বলো, তা-ই হচ্ছে সহজ অঙ্কের জটিলতার ছদ্মবেশ। স্রেফ, তোমাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্যে, তোমরা যাতে তাকে সহজ বলে চিনতে না পার, তার জন্যে।

রফি॥ অশোকদা, তুমি এমন করে বল যে, মনে হয়

অঙ্ক যেন খু-ব সহজ। কিন্তু তাই কি ?

অশোক ॥ আমার তো তাই মনে হয়। ছদ্মবেশ খুলে দিতে পারলেই অঙ্কের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে।

রফি ॥ দু-একটা উদাহরণ দাও, অশোকদা।

অশোক ॥ উদাহরণ দেওয়ার আগে এই সূত্রটা তোর মনে আছে তো ?

শূন্য সমুচ্চয়ে *

রফি ॥ হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন তুমি এই সূত্রের যে কয়টি তাৎপর্যের কথা বলেছিলে, তা-ও মনে আছে।

অশোক ॥ বেশ, তা হলে 'হাল্কা' ছদ্মবেশীদের নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক। হাল্কা ছদ্মবেশীদের সহজে চেনা যায়। যেমন, এই সমীকরণটি একটি হাল্কা ছদ্মবেশী :

$$\frac{1}{x-8}-\frac{1}{x-5}=\frac{1}{x-12}-\frac{1}{x-9}$$

এই সমীকরণের বামপক্ষের হর দুটিকে D_1 ও D_2 এবং ডান পক্ষের হর দুটিকে D_3 ও D_4 ধরলে **'শূন্য-সমুচ্চয়'** সূত্র প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ, $D_1+D_2=D_3+D_4$ কিছুতেই হচ্ছে না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে এবং সামান্য কৌশল অবলম্বন করলে এই ছদ্মবেশীর মুখোস খুলে দেওয়া যায়। আর তা হচ্ছে **উভয়পক্ষের ঋণাত্মক-চিহ্ন সমন্বিত পদ দুটি পক্ষান্তর করা।**

রফি ॥ আমি কি একবার চেষ্টা করে দেখব ?

অশোক ॥ নিশ্চয় তুই চেষ্টা করতে পারিস। আর তুই করলেই আমি সবচেয়ে খুশি হবো।

রফিক খাতায় অঙ্কটি কষতে শুরু করলো

$$\frac{1}{x-8}-\frac{1}{x-5}=\frac{1}{x-12}-\frac{1}{x-9}$$

বা $\frac{1}{x-8}+\frac{1}{x-9}=\frac{1}{x-12}+\frac{1}{x-5}$

$D_1+D_2=x-8+x-9=2x-17$

$D_3+D_4=x-12+x-5=2x-17$

যেহেতু, $D_1+D_2=D_3+D_4=2x-17$

সুতরাং, $2x+17=0$

বা $2x=-17$

বা $x=-\frac{17}{2}$

বা $x=-8\frac{1}{2}$

অশোক ॥ খুব সুন্দর করে অঙ্কটা কষেছিস কিন্তু। চাচী এক কাপ কফি নিয়ে এলেন। অশোক প্লেটটা হাতে নিয়ে বললো—চাচী, রফি এখন এমন অঙ্ক কষছে যে, আমাকেই ওর কাছে শিখতে হবে।

চাচী বললেন—আমার রান্না হয়ে গেছে বাবা। আজ থাক। এবার খেয়ে নাও, রাত হচ্ছে।

অশোক ॥ আর একটু বাকী, চাচী। আর একটা মাত্র অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, রফি—এবার আমরা মাঝারি ছদ্মবেশ নিয়ে দু-চার কথা বলি। আগের ধরনের অঙ্ক কষতে কেবল পক্ষান্তর দরকার, কিন্তু এখানে পক্ষান্তর দরকার নাই। তার পরিবর্তে ভাগ করতে হবে। ছোট ছোট ভাগ করতে নিশ্চয় তোর অসুবিধে হয় না, কি বলিস ?

রফি ॥ ছোট ছোট ভাগে আর কি অসুবিধে ? ও আমি পারি।

অশোক ॥ আচ্ছা, তবে এই সমীকরণটি দেখ :

$$\frac{x-2}{x-3}+\frac{x-3}{x-4}=\frac{x-1}{x-2}+\frac{x-4}{x-5}$$

রফি ॥ এ ধরনের সমীকরণ তো আমাদের পরীক্ষায় প্রায়ই আসে।

অশোক ॥ তা হলে দেখ, কত সহজে এইরকম অঙ্ক কষা যায়। প্রথমে লব-কে হর দিয়ে ভাগ কর। মুখে মুখে করা যায়। তা হলে সমীকরণটি এরকম হয় :

$$1+\frac{1}{x-3}+1+\frac{1}{x-4}=1+\frac{1}{x-2}\ 1+\frac{1}{x-5}$$

রফি ॥ আর বলতে হবে না, অশোকদা। আমি বুঝতে পেরেছি।

অশোক ॥ বেশ, অঙ্কটা কষে দেখা।

রফি এভাবে অঙ্কটি কষলো :

$$1+\frac{1}{x-3}+1+\frac{x}{x-4}=1+\frac{1}{x-2}\ 1+\frac{1}{x-5}$$

বা $\frac{1}{x-3}+\frac{1}{x-4}=\frac{1}{x-2}+\frac{1}{x-5}$

এখানে $D_1+D_2=x-3+x-4=2x-7=D_3+D_4$

সুতরাং $2x-7=0$

বা $x=\boxed{3\frac{1}{2}}$

অশোক ॥ বেশ। আর এক ধরনের ছদ্মবেশী।

রফি ॥ না, অশোকদা। আজ থাক। মা রাগ করছে। দু-বার জানলা দিয়ে দেখে গেছে।

ঠাকুরানী চক, হুগলী

* কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান : এপ্রিল 1983

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

বিবেক রায়

ভারতের কৃতী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা অন্যতম। 1909 সালের 30 অক্টোবর বোম্বাই শহরে ভাবার জন্ম হয়। তাঁর পিতা জাহাঙ্গীর এইচ. ভাবা ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। তাঁর মায়ের নাম ছিল মেহের বাঈ। বোম্বাই-এর ভাবা পরিবার শুধু বিদ্বানই ছিলেন না, ছিলেন বিদ্যোৎসাহীও।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

সতের বছর বয়স পর্যন্ত হোমি পড়াশুনা করেন ক্যাথিড্র্যাল স্কুল, কন্নন স্কুল, গ্রলফিনস্টোন কলেজ এবং বোম্বাই-এর ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্স। হোমির ঠাকুর্দার বিরাট একটি লাইব্রেরী ছিল। বাল্যকাল থেকেই হোমি সেই লাইব্রেরী থেকে পছন্দমত বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। ভাল ভাল গান-বাজনা শোনারও সখ ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। ভারত-বিখ্যাত শিল্পপতি টাটা পরিবারের সঙ্গে ভাবা পরিবারের আত্মীয়তা ছিল এবং সেই সূত্রে টাটাদের বাড়িতে বাল্যকাল থেকেই হোমি যাতায়াত ছিল। নেহেরু পরিবারের সঙ্গেও ভাবা পরিবারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

অনার্স সহ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করার পর 1927 সালে হোমি কেম্ব্রিজের Coius কলেজে ভর্তি হন। 1929-1930 সাল পর্যন্ত তিনি ঐ কলেজের কৃতী ছাত্র। 1930 সালে ঐ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণী লাভ করে মেকানিক্যাল সায়েন্স 'ট্রাইপোস' পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বিজ্ঞানী হলেও হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার শিল্পসুলভ গুণাবলী ছিল। বিশেষ করে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। সঙ্গীতে অনুরাগের কথা তো আগেই বলেছি।

17 থেকে 29 জীবনের এই ক'টি মূল্যবান বছর তিনি বিদেশে পড়াশুনা ও গবেষণা ক'রে কাটান। এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের বহু খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানীর সান্নিধ্যে আসেন তিনি। 1939 সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হয়, হোমি ভাবা তখন ভারতে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে। যুদ্ধ বাধার ফলে তিনি দেশেই থেকে যান।

আবার ফিরে আসা যাক হোমি ভাবার গবেষক জীবনের কথায়। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে তিনি গবেষণা শুরু করেন। 1932 সালে বিজ্ঞানী স্যাডউই'ক নিউট্রন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানী ককক্রফ্‌ট এবং ওয়ালটন উচ্চ গতিসম্পন্ন প্রোটন কণার আঘাতে হাল্কা মৌলের মৌলান্তর ঘটাতে সমর্থ হন। বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট এবং Occhialini গামা রশ্মির বিকিরণ দ্বারা ইলেকট্রনধারার ফটোগ্রাফ ক্লাউড চেম্বারে ধরতে সমর্থ হন। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে দু' বছর কাজ করার মধ্যেই 1931-1932 সালে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় ছাত্রবৃত্তি পান। আবার 1932-1933 সালে তিনি Rouse Ball Travelling Studentship বৃত্তি পান গণিতশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করবার জন্যে। এই বৃত্তি পেয়ে ভাবা ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং জুরিখে বিজ্ঞানী পাউলির অধীনে, রোমে বিজ্ঞানী ফের্মির অধীনে এবং Utrecht-এ বিজ্ঞানী ক্রোমার্স-এর অধীনে গবেষণা করার সুযোগ পান। 1933 সালে ভাবার প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। গবেষণাপত্রের বিষয়বস্তু ছিল গামা রশ্মির শোষণে ইলেকট্রনধারার ভূমিকা। এই গবেষণার জন্যে 1934 সালে ভাবা আইজ্যাক নিউটন ছাত্রবৃত্তি লাভ করে তিন বছর ধরে কেম্ব্রিজে গবেষণা করেন। কিছুকাল কোপেন-হেগেনে বিজ্ঞানী নীলস বোর-এর অধীনেও

গবেষণা করেন। 1935 সালে ভাবা কেম্ব্রিজে থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1937 সালে তিনি আর একটি বৃত্তি পেয়ে কেম্ব্রিজে গবেষণা শুরু করেন। তারপর 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনি স্বদেশে চলে আসেন। সুদীর্ঘ বাইশ বছরের গবেষণা জীবনকালে ভাবার পঞ্চাশটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তার সব ক'টিই তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত। ভাবা বিচ্ছুরণ তত্ত্ব, মহাজাগতিক রশ্মি তত্ত্ব এবং ভেক্টর মেসন তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন।

1940 সালে ডক্টর ভাবা বাঙ্গালোরে ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্সে রীডার-এর পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। 1942 সালে তিনি সেখানে অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।

1945 সালে বোম্বাইতে টাটা ইনস্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ নামক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গবেষণাগারের বর্তমান নতুন ভবনটির উদ্বোধন হয়। 1962 সালে। এই ভবনের স্থাপত্য, আসবাবপত্র, এমন কি সাজানোগোজানো সব কিছুতেই ভাবার হাতের স্পর্শ ছিল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক বার্নার্ড পিটারকে ভাবা এই গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসেন। সেখানে অধ্যাপক পিটার মহাজাগতিক রশ্মি, অধ্যাপক কে চন্দ্রশেখরন বিশুদ্ধ গণিত এবং অধ্যাপক, ডি লাল ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন।

1964 সালে ডক্টর ভাবা ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যানের পদে বৃত হন। এরপর ভারত সরকারের পরমাণুশক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। বোম্বাইয়ের কাছে ট্রম্বেতে স্থাপিত হয় পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র। ভাবা সেই সংস্থার প্রথম অধিকর্তা নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের পরমাণুশক্তি বিভাগের সেক্রেটারীর পদেও তিনি অধিষ্ঠিত হন।

ভাবার নেতৃত্বে ও সুযোগ্য পরিচালনায় ভারতে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলতে থাকে। প্রধানত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ হলেও প্রায়োগিক পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টর ভাবার দূরদৃষ্টি ছিল অপরিসীম। তাই তো ভারত আজ পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হয়েছে। সমর্থ হয়েছে অদৃশ্য পরমাণুজগতের রহস্যকে হাতের মুঠোয় এনে পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে।

ভাবা একদিকে যেমন ছিলেন আদর্শ গবেষক, তেমনি ছিলেন উঁচুদরের প্রশাসক ও সংগঠক। বিজ্ঞান ও পরমাণু প্রযুক্তি বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতির মূলে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার অবদান অপরিসীম।

সারা জীবনে ভাবা অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মান লাভ করে গেছেন। 1941 সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1942 সালে মৌল কণার তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যে অ্যাডামস্ পুরস্কার লাভ করেন। 1954 সালে ভারত সরকারের পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। 1960 সাল পর্যন্ত তিনি International Union of Pure and Applied Physics এর সভাপতি ছিলেন।

ভারতের এই কৃতী বিজ্ঞানী 1966 সালের 24 জানুয়ারী ভিয়েনা যাওয়ার পথে মণ্ট ব্ল্যাঙ্কে এক মর্মান্তিক বিমানদুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু বরণ করেন। ভারত হারায় এক মহান বিজ্ঞানীকে।

স্বাদু ও রম্য ঢঙে লেখা নেবেলজয়ী বিজ্ঞানীদের জীবন চরিত

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫ 00

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

চার ঃ রাজাকোর মেয়ে রোমিলা

কর্নেলের এই স্বভাব বরাবর দেখে আসছি। একসময় ঝানু সখের গয়েন্দা হিসেবে নামডাক ছিল। খুনী আর অপরাধীর পেছন-পেছন ছুটতে পেলে আর কোনোদিকে ফিরে তাকাতেন না। পরিচিত মহলে ওঁকে জনান্তিকে বলা হত 'বুড়ো ঘুঘু।' ইদানিংকালে পোকামাকড়-গাছপালা অর্থাৎ প্রকৃতিচর্চায় মেতে থাকলেও গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজি নন।

রাজাকো-হত্যার রহস্য নিয়ে যে মেতে উঠবেন, জানাই ছিল। আমার কাছে ঘটনাটা জেনে নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেলেন, রাত দশটা বাজতে চলল--ফেরার নাম নেই। বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেছে। এ তল্লাটের আব-হাওয়াই এরকম।

জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাঁর কাছে জানা গেল, 'কাত্তি' কথাটার মানে ফলক। পর্তুগিজ ভাষার শব্দ এটা। কিন্তু কাত্তি বলতে শুধু ফলক বোঝায় না। এর পেছনে আছে একটা খুব পুরনো রোমাঞ্চকর ইতিহাস। প্রাচীন যুগে যে-সব পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা একশোটা বাণিজ্য জাহাজ লুঠের গৌরব অর্জন করত, তারা এই তামার গোলাকার ফলকে নিজের নাম লিখে ঝুলিয়ে রাখত।

কিন্তু তার রোমাঞ্চকর অংশটা হল এই ঃ

দস্যুনেতা লুণ্ঠিত ধনরত্নের যে মোটা ভাগ পেত, তা গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখত। সেই গুপ্তধনের সন্ধান সাংকেতিক চিহ্নে খোদাই করে রাখত ফলকে। মৃত্যুর সময় সে ফলকটা দলের পরবর্তী নেতার হাতে তুলে দিত। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ ফাঁস করত না। তার মানে তুমি যখন নতুন নেতা হচ্ছ, তখন তুমিই ওর অর্থ উদ্ধার করে গুপ্তধনের মালিক হও।

জলজস্যুদের অনেকরকম কুসংস্কার ছিল। ফলকটাকে তারা খুব পবিত্র মনে করত। একশোটি জাহাজ যে লুঠ করতে পারে নি, তার সাহস হত না ওটা গলায় পরতে। তাদের বিশ্বাস ছিল, অনধিকারী ওই পবিত্র ফলক পরলে তার সর্বনাশ হবে।

দেখা যাচ্ছে, রাজাকোবুড়ো কোথাও এই রহস্যময় ফলক পেয়ে গিয়েছিল। তাকে খুন করার পিছনে ফলকঘটিত কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা কে জানে। এর মধ্যে নাকি সতের শতকের দুর্ধর্ষ এক পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা আর্ভেলার নাম রয়েছে। ব্যুগেনভিলি পর্তুগিজ ভাষা জানেন। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারেন নি।

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন এই কোকোস দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে ভারি অদ্ভুত কথা লিখে গেছেন। এটা নাকি লক্ষ বছর আগে ছিল আগ্নেয়গিরি। কালক্রমে জলের তলায় বসে যায়। তারপর অসংখ্য ক্রেটার বা জ্বালামুখ ঘিরে জলের তলায় জমতে থাকে প্রবালকীট। মরা প্রবালকীট আরও লক্ষ বছরে গড়ে তোলে এই সব দ্বীপ। এগুলো আসলে প্রবালদ্বীপ। যাই হোক, এখন সমস্যা হল আদিবাসীদের কিংবদন্তীখ্যাত সেই কিওটা দ্বীপটা কোথায়? হাজারটা ছোট-বড় দ্বীপের সবই কোন না কোন সময় অভিযাত্রীরা খুঁজে হন্যে হয়েছেন। শেষে আমিও দৈবাৎ তার সন্ধান পেয়ে হারিয়ে ফেললাম। এই ফলকটা পেয়ে এখন মনে হচ্ছে, তা হলে কি রাজাকো কি ওটার খোঁজ রাখত?'

ব্যুগেনভিলি তুম্বো মুখে পাইপ ধরালেন। আমার মনটা বেজায় খারাপ। কী চমৎকার একজন আলাপী মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হল এবং নিজের বুদ্ধির দোষেই হয়তো তাকে এভাবে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেললাম। যদি আমার সঙ্গেই সে থাকত, তা হলে তাকে আততায়ীরা আক্রমণের সাহসই পেত না। তা ছাড়া পকেটে আমার গুলিভরা রিভলবারও ছিল।

ব্যুগেনভিলি পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কাত্তিটার

মাঝখানে একটা গাছ আঁকা আছে। কিওটো দ্বীপে অবিকল এইরকম গাছের জঙ্গল দেখেছিলাম।'

জিগ্যেস করলাম, 'সেই গাছগুলোই কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল?'

'না, না! আমি কি কখনও বলেছি যে আমার সঙ্গে কিওটা দ্বীপের গাছপালার কোনো কথাবার্তা হয়েছে? আসলে আমি তখন একনাগাড়ে জলের ঝাপটা খেয়ে ভীষণ ক্লান্ত। গাছগুলো কথা বললেও জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না। গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা।'

'তা হলে কি করে বুঝেছিলেন যে সেটাই কিওটা দ্বীপ?'

জর্জ ব্যুগেনভিলি একটু হাসলেন। 'সাতরাত্রি দ্বীপে ছিলাম। বেলাভূমির ওপরে একটা পাহাড়ী গুহায় ছিল আমার ডেরা। অনেক রাত্রে হঠাৎ কানে আসত আশে পাশের জঙ্গলে অদ্ভুত সব শনশন শব্দ হচ্ছে। প্রথমে ভাবতাম ঝড়। পরে টের পেলাম, ঝড় নয়—যেন গাছপালা থেকে বাতাসের গলায় কারা কথা বলছে। গিয়ে পরীক্ষা করার সাহস হত না।'

'আপনার কানের ভুলও তো হতে পারে!'

'ভুল নয়। কেন তা বলি শুনুন।' নিভেযাওয়া পাইপ আবার লাইটার জেলে ধরিয়ে ব্যুগেনভিলি বললেন, 'কিওটাও এমনি প্রবাল-পাঁচিলে ঘেরা। তা ছাড়া ওটার মাঝখানে একটা ছোট্ট লেক আছে। লেকটা কিন্তু মিঠে জলের। একদিন ব্রেডফুড বা পিঠেফল খেয়েছিলাম পেট ভরে। অনেক রাতে জলতেষ্টা পেল প্রচণ্ড। তখন লেকে জল খেতে গেলাম। জল খেয়ে অন্ধকারে ফিরে এসেছি, হঠাৎ কেউ কোত্থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'অ্যানজেলো! অ্যানজেলো! আমি হকচকিয়ে গেলাম। তারপর শুনি একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর। অ্যানজেলো। অ্যানজেলো! অ্যানজেলো!'

'তারপর?'

'সাড়া দিয়ে বললাম, কে তোমরা? অ্যানজেলো বলে কাকে ডাকছ? আমার নাম জর্জ ব্যুগেনভিলি! বেশ চেঁচিয়ে কথাটা বলেছিলাম। অমনি সব চুপ করে গেল। তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। এ নিশ্চয় ভূতপ্রেতের কাণ্ড! এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে। সারা রাত আর ঘুম হল না। পরদিন দ্বীপের প্রায় সবটাই খুঁজলাম, যদি কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করে থাকে। কিন্তু কোথাও কোনো জনপ্রাণীটি নেই। পাখি বলতে হাঁস আর সারসজাতীয় পাখি আছে। কিন্তু তারা রাত্রিবেলা অমন শব্দ করবে কেন? করলে তো দিনেও করবে—তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন।'

ব্যুগেনভিলি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'প্রবালপাঁচিলে ঘেরা থাকায় সমুদ্রে কোনো জাহাজ গেলেও দেখতে পেতাম না। ধরে নিয়েছিলাম ওখানেই রবিনসন ক্রুশের মতো নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে। লাইফবোটটা ফেঁসে গিয়েছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একখানে একটা মরচেধরা কুড়ুল কুড়িয়ে পেলাম। এসব কুড়ুলকে বলে সেলার্স এক্স। এগুলো নিরপত্তার জন্যে সব জাহাজে থাকে। জাহাজডুবির সময় দৈবাৎ কোনো কামরায় কেউ আটকে পড়লে দরজা বা দেয়াল কেটে তাকে বের করতে এই কুড়ুল কাজে লাগে। কুড়ুলটা পেয়ে বুঝলাম এ এ দ্বীপে কোনো নাবিক আশ্রয় নিয়েছিল কোনোকালে। যাই হোক, কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে পাড়ি দিয়েছিলাম।'

'কিওটার গাছপালার যদি মানুষের মতো চেতনা থাকে, তা হলে কুড়ুল হাতে দেখামাত্র আপত্তি করা উচিত ছিল।'

আমার মন্তব্য শুনে ব্যুগেনভিলি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'তা করে নি। কিন্তু একটা ব্যাপার সত্যি ঘটেছিল। গাছের গায়ে কোপ দেওয়ামাত্র প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। তা ছাড়া প্রতিটি কোপের শব্দেও কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি তো তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। একটা গাছ কুড়ুলের ঘায়ে ধরাশায়ী হওয়ার পর ঝড়টা থেমে গিয়েছিল। তারপর জানেন? যতক্ষণ ধরে ভেলা তৈরি করলাম, মনে হচ্ছিল—সারা বন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং যেন মাঝেমাঝে শোকসঙ্গীত গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝি পোকাদের ডাকও হতে পারে। একজন মরিয়া মানুষের পক্ষে ব্যাপারে কোনো কৌতূহল থাকে কি?'

আমরা কথা বলতে বলতে কর্নেল ফিরে এলেন। রেনকোট খুলে রেখে বললেন, 'এখানকার পুলিশের কাজ কর্ম ভারি অদ্ভুত! বলে কী, এরকম হয়েই থাকে জুয়াড়ীদের মধ্যে। রাজাকো লোকটা ছিল পাকা জুয়াড়ী। তা ছাড়া এই বৃষ্টির মধ্যে খুনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তে তারা রাজি নয়। সকালে দেখা যাবে।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'এতক্ষণ কি থানায় বসেছিলেন আপনি?'

আকাশে তারাদের গতিপথ

বিমান বসু

একটা খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশটাকে কেমন দেখায় তোমরা নিশ্চয়ই জানো। দেখায় ঠিক যেন একটা বিশাল আধা গোলাকার উপুড় করা বাটির মতো। মাথার ওপরে আকাশটাকে মনে হয় সবচেয়ে উঁচু। আবার দিগন্তের কাছে যেন সে মাটি ছুঁয়ে আছে।

এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে কোনও জায়গা থেকে পুরো আকাশের কেবলমাত্র অর্ধেকটাই আমরা দেখতে পাই। বাকি অর্ধেকটা থাকে দিগন্তের নিচে। দুইএ মিলে বলতে পারবো যে, আকাশটা হলো একটা বিশাল ফাঁপা গোলকের মতো যার ঠিক কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আমাদের পৃথিবী (যেমন 1নং ছবিতে দেখানো হয়েছে)। ঐ গোলকের মতো আকাশের গায়েই আমরা দেখতে পাই চাঁদ, সূর্য আর গ্রহনক্ষত্রের আনাগোনা।

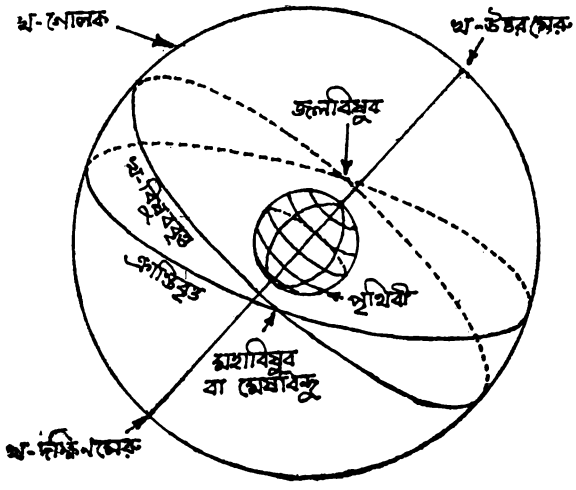

১নং চিত্র খ-গোলক ও পৃথিবী

আসলে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই হলো কাল্পনিক। আকাশের কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই, আর আকাশে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের দৈনিক গতিও কেবল আমাদের চোখের ভ্রম। কারণ পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে অনন্ত শূন্য যার কোনও সীমানা নেই। আর আকাশে চাঁদ, সূর্য তারা পূব থেকে পশ্চিমে চলছে মনে হয় পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘুরছে বলে। তবুও তারা চেনার জন্যে ঐ কাল্পনিক আকাশের ব্যবহারের অনেক সুবিধে আছে। যেমন ধরো তারাদের নিজ নিজ অবস্থান নির্ধারণের বেলায়।

পৃথিবীর চারপাশে আকাশের ঐ কাল্পনিক গোলককে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন 'খ-গোলক'। পৃথিবীর (ভূ গোলকের) মতো খ-গোলকেরও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং বিষুববৃত্ত আছে যাদের বলা হয় যথাক্রমে খ-উত্তরমেরু, খ-দক্ষিণমেরু এবং খ-বিষুববৃত্ত। পৃথিবীর অক্ষরেখাকে উত্তরমেরু বরাবর বাড়িয়ে দিলেই পাওয়া যায় খ-উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু' বরাবর বাড়ালে পাওয়া যায় খ-দক্ষিণমেরু আর পৃথিবীর বিষুবতলকে চারপাশে বাড়িয়ে দিলেই পাওয়া যায় খ-বিষুববৃত্ত।

এছাড়া, ভূগোলকের ওপর কাল্পনিক অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার মতো খ-গোলকের ওপরেও খ-বিষুববৃত্তের সমান্তরাল বরাবর বিষুবলম্ব এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিষুবাংশ রেখা আঁকা যেতে পারে, যার সাহায্যে আকাশে যে কোনও তারা বা জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্ণয় করা খুবই সহজ হয়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা মানচিত্রে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা দেখে কোনও অজানা শহর খুঁজে বের করার মতো। তবে এখানে দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে।

ভূগোলকের বেলায় অক্ষাংশ মাপা হয় ডিগ্রীতে বিষুবরেখা থেকে নিয়ে উত্তরে এবং দক্ষিণে। যেমন ধরো কলকাতার অক্ষাংশ হলো 22·5 ডিগ্রী উত্তর; অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্নের অক্ষাংশ 37·5 ডিগ্রী দক্ষিণ। এখানে বিষুবরেখার অক্ষাংশ ধরা হয় শূন্য ডিগ্রী। খ-গোলকের বেলায়ও বিষুবলম্ব মাপা হয় ডিগ্রীতে খ-বিষুববৃত্ত থেকে নিয়ে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে। কিন্তু এখানে উত্তর বিষুবলম্বের জন্যে (+) চিহ্ন এবং দক্ষিণ বিষুবলম্বের জন্য (−) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। মানে, খ-বিষুববৃত্তের উত্তরে যত তারা আছে তাদের বিষুবলম্ব (+) আর দক্ষিণের তারাদের বিষুবলম্ব (−)। যেমন ধরো আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের বিষুবলম্ব

হলো —16·5 ডিগ্রী। মানে তারাটিকে দেখা যায় খ-বিষুববৃত্তের দক্ষিণে। আর একটা উজ্জ্বল তারা অভিজিৎ-এর বিষুবলম্ব হলো + 38·5 ডিগ্রী। এ তারাটি আছে খ-বিষুববৃত্তের উত্তরে।

বিষুবাংশের বেলায় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। ভূগোলকের ওপর কোনও স্থানের দ্রাঘিমা মাপা হয় ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ মধ্যরেখাকে কেন্দ্র করে পূব বা পশ্চিমে। যেমন ধরো, কলকাতার দ্রাঘিমা হলো 88 ডিগ্রী পূর্ব, মানে কলকাতা গ্রীনউইচের পূবে রয়েছে আর তাদের মধ্যেকার কৌণিক দূরত্ব হলো 88 ডিগ্রী। একইভাবে, নিউইয়র্ক শহরের দ্রাঘিমা হলো 74 ডিগ্রী পশ্চিম, মানে গ্রীনউইচের পশ্চিমে এ শহরটির কৌণিক দূরত্ব হলো 74 ডিগ্রী। এখানে পূব বা পশ্চিম ধরা হচ্ছে গ্রীনউইচ মধ্যরেখাকে কেন্দ্র করে। খ-গোলকের বিষুবাংশের বেলায় ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুটি হলো মহাবিষুব বা মেষবিন্দু। তবে এখানে মেষবিন্দুর পূব বা পশ্চিম হিসেবে বিষুবাংশ মাপা হয় না। তার বদলে, আকাশে মেষবিন্দুর মধ্যগমনের সময় থেকে নিয়ে যে কোনও তারার মধ্যগমনের মধ্যে যে সময় (ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে) লাগে সেটাই হলো সেই তারাটির বিষুবাংশ। যেমন ধরো, লুব্ধকের বিষুবাংশ হলো 6 ঘণ্টা 40 মিনিট। এর মানে হলো এই যে, আকাশে মেষবিন্দুর মধ্যগমনের 6 ঘণ্টা 40 মিনিট পরে লুব্ধকের মধ্যগমন হয়। এখানে লুব্ধকের মধ্যগমন বলতে কি বোঝায় একটু পরে বলছি।

বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ ছাড়া খ-গোলকের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো ক্রান্তিবৃত্ত। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আকাশে সূর্য সারা বছর এক জায়গায় থাকে না। শীতকালে সে দক্ষিণদিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার গরমকালে উত্তরে সরে যায়। এখন, যদি প্রতিদিন কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধরো দুপুরে, আকাশে সূর্যের অবস্থান চিহ্নিত করে রাখা যায় তা হলে বছরের শেষে সেই বিন্দুগুলি যোগ করলে যে বৃত্তটি পাওয়া যায় সেটাই হলো ক্রান্তিবৃত্ত। আমরা বলতে পারি যে, ক্রান্তিবৃত্ত হলো আকাশে সূর্যের চলার পথ। তা ছাড়া ঐ ক্রান্তিবৃত্তের ওপরেই দেখতে পাওয়া যায় রাশিচক্রের বারটি রাশিকে।

খ-গোলকের ওপর ক্রান্তিবৃত্তটি খ-বিষুববৃত্তের সঙ্গে 23·5 ডিগ্রী কোণাকুণিভাবে রয়েছে। এখন, যদি তোমরা মনে রাখো যে পৃথিবীর অক্ষও তার কক্ষতলে 23·5 ডিগ্রী হেলে রয়েছে, তা হলেই বুঝতে পারবে দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কি। যদি পৃথিবীর অক্ষ হেলে না থাকত তা হলে আকাশে সূর্য সারা বছর একই জায়গায়, ঠিক বিষুবরেখার ওপরে থাকত। তা ছাড়া ক্রান্তিবৃত্ত আর খ-বিষুববৃত্তও তা হলে একই হত।

আড়াআড়িভাবে থাকার দরুন ক্রান্তিবৃত্ত খ-বিষুববৃত্তকে দুটো বিন্দুতে ছেদ করে, যাদের বলা হয় বিষুববিন্দু। এদের মধ্যে একটি হলো মহাবিষুব এবং অন্যটি জলবিষুব। এই দুটি বিন্দুতে যখন সূর্য আসে তখন সে থাকে আকাশে ঠিক বিষুববৃত্তের ওপর। ফলে বছরে দুটি দিন—21 মার্চ ও 23 সেপ্টেমবর—পৃথিবীর সব জায়গায় দিন-রাত্রি সমান হয়।

তারা চেনার জন্যে আরও দুটো জিনিস চিনে নেওয়া দরকার। সেগুলো হলো সুবিন্দু এবং খ-মধ্যরেখা। প্রথমটি হলো মাথার ঠিক ওপরে আকাশে একটা কাল্পনিক বিন্দু। দ্বিতীয়টি হলো একটি কাল্পনিক রেখা যা সুবিন্দুকে ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তের সঙ্গে যোগ করছে। খ-মধ্যরেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতিষ্ক প্রতিদিন একবার, দিনের বেলায়ই হোক কিংবা রাত্রে, ঐ রেখা পূব থেকে পশ্চিমে পার হয়, যাকে বলা হয় মধ্যগমন। এখানে মনে রেখো, মধ্যগমনের সময় যে কোনও জ্যোতিষ্ক আকাশে দক্ষিণ দিগন্তের ওপর সর্বোচ্চবিন্দুতে থাকে, আর সেজন্যে মধ্যগমনই হলো যে কোনও তারামণ্ডলকে চিনে নেওয়ার সবচেয়ে ভাল সময়।

এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা হলো সেসব তোমাদের কাছে হয়তো একটু জটিল মনে হতে পারে। তোমরা হয়তো ভাবছ যে, শুধু চোখে তারা চেনার জন্যে এসবের আবার দরকার কি? দরকার হয়তো এখনই পড়বে না। তবে একটু চেষ্টা করে যদি ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারো তা হলে দেখবে আকাশে তারাদের চালচলন বুঝতে কত সুবিধে হয়ে যাবে।

এবারে এসো দেখা যাক, রাতের আকাশে তারাদের চলন কেমন দেখায়। আগেই বলেছি, পূব থেকে পশ্চিমে তারাদের চলন হলো আমাদের চোখের ভ্রম। পৃথিবী নিজের অক্ষে পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছে বলেই অমন মনে হয়। আকাশের সব তারাই কিন্তু পূব থেকে পশ্চিমে চলতে দেখায় না। সেটা নির্ভর করে আকাশে কোন জায়গায় তারাটি আছে, মানে তার বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ কি, তার ওপর। যেন ধরো উত্তরে ধ্রুবতারার বেলায়। পৃথিবীর আকাশে ধ্রুবতারাকে দেখে মনে হয় যেন স্থির হয়ে আছে। এর কারণ হলো এই যে, খ-গোলকে ধ্রুবতারার অবস্থান হলো ঠিক খ-উত্তরমেরুর ওপর (আসলে একটু পাশে), অর্থাৎ সে আছে পৃথিবীর অক্ষ বরাবর ঠিক উত্তরমেরুর ওপর। এর ফলে আকাশে তার অবস্থানের

ওপর পৃথিবীর আহ্নিক গতির কোনও প্রভাব পড়ে না।

আকাশের বাকি সব তারা মনে হয় যেন ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে ঘুরছে। এর ফলে কিছু তারা

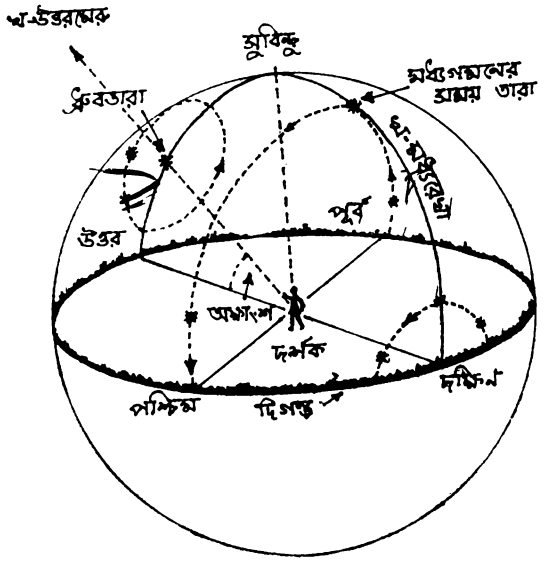

আকাশে তারার চলন

পূব দিকে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। কিছু উত্তর-পূবে উঠে উত্তরপশ্চিমে অস্ত যায়, আবার কিছু দক্ষিণপূবে উঠে দক্ষিণপশ্চিমে অস্ত যায়। কোন্ তারা কোন্ দিকে ওঠে আর অস্ত যায় সেটা নির্ভর করে দুটি জিনিসের ওপর। এক, তারাটির বিষুবলম্ব কি এবং দুই, কোথা থেকে দেখা হচ্ছে।

যেমন ধরো যদি উত্তরমেরু থেকে আমরা আকাশটাকে দেখি, তবে দেখব যে ধ্রুবতারা রয়েছে ঠিক মাথার ওপর। উত্তর আকাশের বাকি সব তারা তাকে ঘিরে দিগন্তের সমান্তরালে পাকে খেতে দেখা যাবে। সেগুলি কখনোই অস্ত যাবে না।

অবশ্য তাদের দেখতে পাওয়া যাবে কেবলমাত্র যখন সূর্য দিগন্তের নিচে থাকবে তখনই। আর একটা কথা, এখান থেকে দক্ষিণ আকাশের কোনও তারাই কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে না। কারণ সেগুলি সারা বছরই দিগন্তের নিচে থাকবে।

আবার, যদি আমরা বিষুবরেখার ওপর কোনও জায়গা থেকে দেখি, তা হলে আকাশে তাদের চলন হবে একেবারে অন্যরকম। সেখান থেকে ধ্রুবতারাকে দেখা যাবে একেবারে উত্তর দিগন্তে। বাকি সব তারা আকাশে চলবে ঠিক পূব-পশ্চিম রেখা বরাবর। বিষুবরেখা থেকে আকাশ দেখার একটা বিশেষ সুবিধে হলো এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ আকাশের সমস্ত তারাই এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক মাঝামাঝি অক্ষাংশের কোনও জায়গা থেকে আকাশটা কেমন দেখাবে। বিষুবরেখার উত্তর থেকে দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা কখনোই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেগুলি কখনোই দিগন্তের ওপরে ওঠে না। অপরদিকে উত্তর আকাশের কিছু তারা কখনোই অস্ত যায় না (অবশ্য তাদের দেখা যায় কেবল মাত্র রাত্তিরে)। বিষুবরেখার দক্ষিণ থেকেও একই ব্যাপার। সেখান থেকে দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা কখনোই অস্ত যায় না, আবার উত্তর আকাশে কিছু তারা কখনোই উদয় হয় না।

সুতরাং বুঝতে পারছো, রাতের আকাশটা কেমন দেখাবে আর তাতে তারাদের চলন কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে যেখান থেকে দেখা হচ্ছে সেখানকার অক্ষাংশের ওপর। একটা উদাহরণ দিই। ধরো আমরা জানতে চাই কলকাতার আকাশে কোন্ তারা কখনোই অস্ত যাবে না আর কোন্ তারা কখনোই উদয় হবে না। কলকাতা অক্ষাংশ হলো 25·5 ডিগ্রী উত্তর। সামান্য হিসেব করলেই দেখা যাবে যে, (90—22·5) বা 77·5 উত্তর বিষুবলম্বের ওপরে, মানে +77·5 ডিগ্রী ও +90 ডিগ্রী বিষুবলম্বের মধ্যে, যে সব তারা আছে সেগুলি কলকাতার আকাশে কখনোই অস্ত যাবে না।

আবার ঠিক একইভাবে দক্ষিণ আকাশে—77·5 ডিগ্রী বিষুবলম্বের মধ্যে যে সব তারা আছে তাদের কখনোই কলকাতার আকাশে দেখতে পাওয়া যাবে না।

7 UF কলেজ রোড, নয়াদিলী—1

দাবানল

প্রবীরকুমার পাল

'দাবানল' নামটা শুনলেই আমাদের ভয়-ভয় লাগে। মনে পড়ে যায় খাণ্ডববন দহনের কথা। লেলিহান শিখার বিশাল এক অগ্নিকাণ্ড! বনের পর বন পুড়ে ছাই!

অত্যন্ত ঠাণ্ডা, ভেজা ও শুকনো অঞ্চল ছাড়া সব অরণ্যেই দাবানল দেখা যেতে পারে। আমরা আগুন ব্যবহার করার আগে কেবল প্রাকৃতিক উপায়ে বনে আগুন লাগত। প্রাকৃতিক উপায় বলতে ঝড়-বৃষ্টির সময় উঁচু ভোল্টের বিদ্যুৎ-ক্ষরণ। একে সাধারণভাবে বলে 'বাজপড়া।' বাজ পড়ে একটি গাছ থেকে সারা বনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় প্রায়ই দূরের পাহাড়ে বা অরণ্যে দাবানল দেখা যায়। পাহাড়ীদের বিশ্বাস যে, গাছে-গাছে ঘর্ষণে নাকি এরূপ হয়। যদিও অনেকে বলবেন যে, গাছের ডালে ডালে ঘর্ষণ লাগার সম্ভাবনা খুব কম এবং ঘর্ষণ লাগলেও তা থেকে আগুন সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? কিন্তু কাঠে কাঠে ঘর্ষণে আগুন সৃষ্টি হতে আমি দেখেছি। কাঠের মিস্ত্রিরা একটা কাঠের পাটাতনের ওপর কাঠের তৈরী একটা তীক্ষ্ণমুখ দণ্ড দিয়ে সজোরে ঘুরিয়ে ছিদ্র করলে ছিদ্রের অপর মুখ দিয়ে যে কাঠের গুঁড়ো বেরিয়ে আসে তা জ্বলন্ত এবং তা থেকে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বিড়ি ধরাতে পারে। সুতরাং ডালে ডালে অনবরত ঘর্ষণের ফলে শুকনো কাঠ জ্বলে উঠে অরণ্যে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে।

আবার কৃত্রিম্ উপায়েও বনে আগুন লাগতে পারে। কৃত্রিম উপায় বলতে মানুষের দ্বারা বোঝায়। কেউ স্বেচ্ছায় পাতা-ডাল ইত্যাদি জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেয়, কেউ আবার অজান্তে জ্বলন্ত বিড়ির অবশিষ্টাংশ শুকনো পাতার ওপর ফেলে দেয়। আর তা থেকে বিশাল দাবানলের সৃষ্টি হতে পারে।

দাবানল কি কেবল 'দাউ-দাউ' করে আগুন জ্বলা? না। অরণ্যে তিন রকমের দাবানল দেখা যেতে পারে। কোন মাটিতে জৈবপদার্থ প্রচুর পরিমাণে জমা থাকলে তাতে আগুন লেগে 'আন্তর দাবানল' সৃষ্টি হতে পারে। এতে কোন শিখা দেখতে পাওয়া যায় না। খুব ধীরে ধীরে সমগ্র অঞ্চল গ্রাস করে। এতে বড় বড় বৃক্ষ ছাড়া ছোট ছোট গাছগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বৃক্ষদের মধ্যেও যাদের মূল গভীরে যায় না তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

আবার মাটির ওপরে প্রচুর শুকনো ডালপালা, পাতা অকর্ষিত অবস্থায় থাকলে আগুন শিখা নিয়ে 2—$2\frac{1}{2}$ ফুট উঁচু হয়ে জ্বলতে পারে। একে 'পৃষ্ঠ দাবানল' বলে। এতে বীরুৎ ও গুল্ম সব গাছ পুড়ে শেষ হ'য়ে যায়। বৃক্ষের গোড়াগুলোও পুড়ে যায়। অনেক সময় এ ধরনের দাবানলে মূল, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড, বীজ ইত্যাদি অংশগুলো আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

আগুন যখন গাছের আগায় লেগে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে তখনই যে দাবানল হয় তা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। একে 'শীর্ষ দাবানল' বলা যায়। এতে অনেক সময় মাটির ছোটখাট বীরুৎ, বড় গাছের মূল, এরা রক্ষা পেয়ে যায়।

দাবানল, তা যেমনই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক, অরণ্যের বেশির ভাগ সদস্যের তাতে ক্ষতি হবেই। এমনও দেখা গেছে যে, একটা বড়সড় দাবানলের পর হাজার হাজার বছর লেগে গেছে সেখানের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে। তবে তাদের মধ্যেই কয়েকজন যেন এক একটা ক্ষুদে বিপ্লবী, আগুন তাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। এরা আগুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিশেষ অস্ত্র তৈরী করে ফেলেছে।

রাস্ (কাঁকড়াশ্রীংগি), সীনোথাস্ প্রভৃতি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদেরা অসংখ্য বীজ সৃষ্টি করে। বীজত্বক এতই শক্ত যে তারা আগুনে তো পোড়েই না; বরং তাদের ত্বক ফেটে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডের পরে অঙ্কুরিত হয়ে প্রচুর চারা জন্মায়। দেখা গেছে, পাঁচ মিনিট ধরে 110°—115° সে. তাপে এরা সবচেয়ে ভাল অঙ্কুরিত হয়! যে প্রচণ্ড তাপে অন্যান্য গাছ পুড়ে যায়।

'পাইনাস প্যালাস্ট্রিস' এক জাতীয় পাইন গাছ। এদের অংকুরোদগমের পর প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত অগ্রমুকুল মাটির খুব কাছাকাছি থাকে আর তাকে পাহারা দিয়ে থাকে ঘন পাতার আচ্ছাদন। পাতাগুলো লম্বা লম্বা সূঁচের মতো। আগুন লাগলেও পাতাগুলোকে সব পোড়াতে পারে না। আগুন নিভে যাওয়ার পর হঠাৎই অগ্রমুকুলকে সঙ্গে নিয়ে কাণ্ডটা এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে, কয়েক মাসেই গাছটি বিরাট হয় আর কাণ্ডে অগ্নিরোধী স্তর জমে। তাই এদেরকে পোড়াতে গেলে দাবানলকে 15/20 দিন অন্তর অন্তরই আসতে হয়। কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব।

আর এই জাতীয় পাইন গাছের শ্রীপুষ্পপত্র মঞ্জরী ফেটে তা থেকে বীজ বেরোতেই 20 বছর পর্যন্ত লেগে যায়। জল ও খাদ্য যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হলে তবেই তা ফাটে। আগুন লেগে কাণ্ড পুড়ে গেলে জল ও খাদ্য যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আর পুষ্পপত্রমঞ্জরীগুলিও চট্‌পট্ ফেটে বীজ ছড়িয়ে দেয়। তাই এরা দাবানলকে স্বাগত জানায়।

বেটুলা, উলেক্স প্রভৃতি গাছের মজাটা আরও সুন্দর। এদের পাতায় থাকে এক ধরনের তেল। আগুন লাগলে এরা যজ্ঞের পুরোহিতের মতো তেল বার করতে থাকে। আর চড়চড় করে তেল পুড়তে থাকে। কিন্তু পাতা যেমন ছিল প্রায় তেমনই থাকে।

অধিকাংশ পাইন, ওক্ এবং পাইন জাতীয় ল্যারিকস্ গাছের কাণ্ডে যে অগ্নিপ্রতিরোধী স্তর থাকে তা এদেরকে দাবানলের দহন থেকে বাঁচায়।

কখনও কখনও আবার দেখা যায় যে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও পোড়া কাণ্ড থেকে নতুন শাখা বেরুচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কাক্ষিক বা অস্থানিক মুকুলগুলো কাণ্ডের অনেক গভীরে লুকানো থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায় ইউক্যালিপটাস্, এক জাতীয় বার্চ, ভ্যাকৃসিনিয়াম, সেকোইয়া এবং এক জাতীয় পাইন গাছে।

শীর্ষ দাবানলে গাছের বিরাট অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কোন কোন গাছের এতেও 'ডোণ্টকেয়ার' ভাব দেখা যায়। মাটির নিচে এদের বৃহৎ (4 মিটার পর্যন্ত ব্যাস) আলুর মতো স্ফীতকন্দ থাকে, যা থেকে আবার নতুন গাছ জন্মাতে পারে। লিগ্‌নিন্ নামক পদার্থ দিয়ে এগুলো আবৃত থাকে বলে সহজে পোড়েও না। এরকম 'গেরিলা যুদ্ধে'র সৈনিক হলো ইউক্যালিপটস্‌া, আর্কটোস্ট্যা ফাইলস্ প্রভৃতি গাছেরা।

আর একরকম 'আগুনে গাছ' আছে, যার পোষাকী নাম এপিলোবিয়াম। এদের কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এরা সাধারণভাবে খুব ছোট আকারে থাকে; আর আগুনে বড় বড় গাছগুলোকে শেষ করে দিলেই এরা হু-হু ক'রে বেড়ে গিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সংখ্যায় প্রচুর বেড়ে গিয়ে সারা বন ছেয়ে ফেলে। আগুনে উদ্দীপিত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করার ঘটনা আরও দেখা যাবে দুর্বাঘাস বা ঐ জাতীয় কয়েকটি ঘাসে এবং পপুলাস নামক বৃক্ষে।

এভাবেই একটা প্রচণ্ড দাবানলেও অরণ্যটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কিছু সদস্য নিজের জোরে বেঁচে থাকে আর কিছু বেঁচে যায় ভাগ্যের জোরে। নেতা মরলে যেমন তার চেলাচামুণ্ডারাই নেতা বনে যায়, তেমনি বেঁচে-যাওয়া গাছগুলিই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে নতুন অরণ্য গড়ে তোলে। অতএব দাবানলে তারা লাভবান হয় বৈকি!

গ্রাম—বলরামপুর, পোঃ—রাঙ্গাডি, পুরুলিয়া

গণ্ডার

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

গণ্ডার নিরামিষাশী প্রেণী। সমগ্র পৃথিবীতে এই গণ্ডার কিন্তু পাঁচ রকমের। তার মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশে পাওয়া যায় দু রকমের সাদা ও কালো, এদের দুটো করে শিং। চোখ মুখের ত্রিকোণ স্থান থেকে ঠিক পাশাপাশি সাজানো। অন্য তিন শ্রেণীর গণ্ডারকে দেখা যায় এশিয়া মহাদেশে। ভারতীয় জাভা ও সুমাত্রার গণ্ডারদের একটি করে শিং আছে।

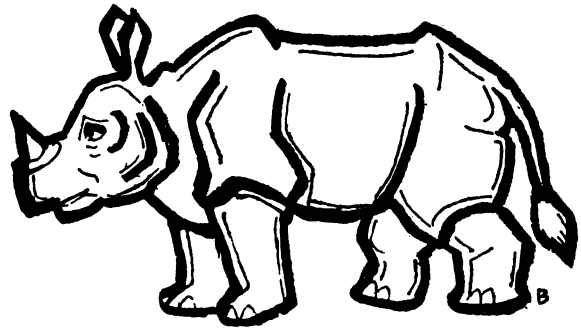

শরীরে এরা খুবই শক্তিশালী। ওজনেও ভারী। পথ চলে আস্তে আস্তে। দেখলেই বোঝা যায় গণ্ডার বড় অলস প্রকৃতির জন্তু। তবে এই গণ্ডারকে যদি কোন-রকমভাবে আক্রমণ করা হয় তা হলে কিন্তু গণ্ডার ছেড়ে কথা কয় না, ভয়াবহ ও হিংস্র হয়ে ওঠে। ভাবলে অবাক লাগে ওই চেহারা নিয়ে গণ্ডার তখন ঘণ্টায় 30 মাইল পর্যন্ত দৌড়য় এবং শক্ত ছুঁচালো শিং তার প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র জাতীয় গণ্ডার পাওয়া যায় সুমাত্রায়, যার ওজন এক টনের থেকেও কম। উচ্চতায় তিন থেকে চার ফিট্। অবশ্য আফ্রিকার গণ্ডাররা আকারে সবচেয়ে বড় আর প্রশস্ত। উচ্চতায় সাড়ে ছয় ফুট্, ওজনে প্রায় তিনশো কিলো। গণ্ডারের পায়ে থাকে তিনটে করে পাতা, অনেকটা ঘোড়ার মতো। শিংটা লম্বা হয় সাধারণত সাড়ে বাষট্টি ইঞ্চি আর এটা তৈরী হয় একগুচ্ছ 'চুল বা শন' জাতীয় পদার্থ দিয়ে। গণ্ডারদের সারা গায়ে লোম থাকে না। শুধুমাত্র চোখের কোলে এবং লেজের গোড়ায় কিছু কিছু দেখা যায়। এদের গায়ের চামড়া ভীষণ শক্ত। এত শক্ত যে কোন কাজেই আসে না। এরা একা থাকতে ভালোবাসে। অতি কদাচিৎ দলবদ্ধভাবে দেখা যায়। স্ত্রী গণ্ডাররা মাত্র একটি করেই সন্তান ধারণ পারে। শিশু গণ্ডার মাতৃগর্ভে প্রায় আঠারো মাস থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে গণ্ডার বাঁচে খুব বেশি হলে 50 বছর।

37/1, আগরওয়ালা গার্ডেন রোড, কলকাতা-34

বন-বিড়াল

ধীরেন দত্ত

শিকার কর কিম্বা শিকার হও জঙ্গলের রাজ্যে
এই নিয়ম চলে আসছে আবহমান কাল ধরে।

ধানকাটা হয়ে গেলে সুন্দরবন এলাকার লোকদের আর কোন কাজ থাকে না। মহাজনরা এখন ধীরে সুস্থে মজুর লাগাবে। আর সেইজন্যে মজুরীর দামও কমে যাবে। সুন্দরবনের বসতি এলাকার ক্ষেতমজুরদের এই সময় থেকেই চলে মধ্যে মধ্যে অনাহার কিংবা অর্ধাহার।

পেট যখন কাঁদে, বাচ্চাকাচ্চারা খিদেয় কোঁকায়, তখনই জঙ্গল আমাদের হাতছানি দেয়। আবদুল খবর এনেছে সুন্দরবনের জঙ্গলের বুড়ির-ডাবরির পাশ দিয়ে যে ফোড়নটা ঢুকে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে খালটা একেবারে মজে গেছে, ওখানে লম্বা একটা গোলপাতার জঙ্গল, আর এখনও কেউ ওখানে হাত লাগায় নি। আমরা যদি ওখান থেকে গোলপাতা কেটে আনি, বছরের বাকি সময়টা অন্ততঃ ছেলেমেয়েরা ক্ষিদেয় কাঁদবে না।

সুন্দরবনের নোনা মাটিতে আর নোনা জলে যে সমস্ত গাছ জন্মায় গোলগাছ তাদের মধ্যে একটা। এই গাছগুলো অনেকটা নারকেল গাছের মতো দেখতে। কিন্তু নারকেল গাছের যেমন আকাশছোঁয়া গুড়ি হয়, গোলগাছের তা নেই। ওদের গুড়ি দু-তিন ফুটের চেয়ে লম্বা হয় না, আর মরশুমে গোল গোল ফল ধরে। গাছের মাথায় নারকেল গাছের মতই ঝাঁকড়া পাতা। প্রতি বছর বহু অভাবী মানুষ জঙ্গলে ঢোকে গোলপাতা কেটে আনতে। জঙ্গলের লাগোয়া বসতি এলাকায় ঘরের ছাউনি করার জন্যে গোল-পাতার খুবই চাহিদা। দামে সস্তা পড়ে, টেঁকসই আর দেখতে সুন্দর।

বুড়ির-ডাবরিতে আমরা তেরজন লোক তিনটে নৌকো গোলপাতায় বোঝাই করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি! যে পথ দিয়ে আমরা বাদায় ঢুকতাম, পথের পাশে একটা গেঁয়ো গাছের ধোঁড়ের ভেতর আমরা একটা সোড়েলের বাসা আবিষ্কার করেছিলাম। সোড়েল হচ্ছে বেজী জাতীয় প্রাণী। বেজীর মতোই দেখতে, কিন্তু ছোট-বেজীর প্রায় তিন গুণ। ভারতের প্রায় সর্বত্র, আসাম, ব্রহ্মদেশ, চীন ও মালয়ের পাহাড়ে জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে এদের গতিবিধি। সাধারণত মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া, জলজ-শামুক খেয়েই প্রাণ ধারণ করে। গৃহস্থের হাঁস-মুরগী ধরে নিয়ে ঢুকে যায় নিরাপদ স্থানে। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। বেগুন ক্ষেতে ঢুকে বেগুন এবং নানারকম ফলপাকড়ও এদের সময় সময় খেতে দেখা গেছে।

একবার হাবড়ার কাছে এক গ্রামে গৃহস্থের বাড়ি থেকে গুড় চুরি করে খাবার সময় একটা প্রাণী মারা পড়ে। লেজ ধরে টেনে এনে উঠোনে শুইয়ে দিল প্রাণীটাকে। গালের কাছ থেকে ঘাড় পর্যন্ত সাদা দাগ, শরীর ধূসর লোমে ঢাকা, তলপেট হলটে সাদা। দেখেই ওকে আমি সোড়েলের একটা প্রজাতি বলে চিনলাম। মাথা থেকে শরীরটা দু ফুটের মত লম্বা, ঝাঁটার মত লেজটা দেড় ফুট।

সুন্দরবনে এই প্রাণীটাকে আগেও দেখেছি। এবারে ওর বাসার কাছে গিয়ে ধোঁড়ের মধ্যে টর্চের আলো ফেললাম। লাল লাল বিড়াল-ছানার মত চারটে বাচ্চা, তখনও তাদের গায়ে লোম গজায় নি বা চোখ ফোটে নি। রোজই যখন আমরা ঐ পথ দিয়ে যেতাম সোড়েলের বাচ্চাদের হাল দেখে যেতাম, আর ওদের বাসার কাছে গেলেই ধাড়ি সোড়েল দুটো ফোঁস্ ফোঁস্ করে গোঁঙাতো আর আমাদের আক্রমণ করতে চাইতো, কিন্তু আমাদের হাতের ধারালো হেঁসোকে ওদের দারুন ভয়।

জঙ্গলে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, গোল-পাতায় আমাদের নৌকোগুলো প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে, সেইসময় একদিন বাদা থেকে নৌকোয় ফেরার পথে যেই না আমরা গেঁয়োগাছটার কাছাকাছি এসেছি, দূর থেকে একটা দারুণ গোঁঙানি আর ফোঁস্‌ফোঁসানির শব্দ পেলাম। সোড়েলদের বাসার কাছে কি যেন একটা হচ্ছে। ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে আমরা গুড়ি মেরে সন্তর্পণে এগুতে লাগলাম। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, একটা বন-বিড়াল জোর করে সোড়েলের বাসার মধ্যে ঢুকতে চাইছে, আর সোড়েল দুটো প্রাণপণে ওকে বাধা দিচ্ছে।

দারুন আক্রোশে সোড়েল দুটো বন-বিড়ালটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ওদের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, আর মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে শত্রুর ওপর। ওরা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখনই ওদের পাছার কাছের

গ্রাণ্ড দিয়ে একটা দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিক্ষেপ করছিল আক্রমণকারীর দিকে। কিন্তু অনেকক্ষণ লড়াইয়ের পর শক্তিশালী বন-বিড়ালটাকে ওরা ঠেকাতে পারল না, জোর করে সে ঢুকে পড়ল সোড়েলদের ধোঁড়ের ভেতর। সোড়েল দুটো একটানা চারপাশে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগলো আর গোঁঙাতে লাগলো। মনে হলো ওরা যেন কাঁদছে। একটু পরে যখন আমরা ধোঁড়ের ভেতর টর্চের আলো ফেললাম, দেখলাম বন-বিড়ালটা তার লাল জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। বুঝলাম, ফলারটা মন্দ হয় নি।

সুন্দরবনে মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে বাঘের পরই বন-বিড়াল বা জাঙ্গাল ক্যাটের দাপট। বসতি এলাকার লোকেরা এদের বলে খটাশ, অনেক বলে কটাশ। অবশ্য বাংলাদেশে খটাশ বা কটাশ বলতে অনেকগুলো প্রাণীকেই বোঝায়। বন-বিড়াল, মাছ-বিড়াল, সোড়েল বা অন্য যে কোনো প্রাণী গৃহস্থের হাঁস-মুরগী চুরি করে নিয়ে পালায়, বাংলাদেশে তাদের সবাইকেই খটাশ বা কটাশ বলে অভিহিত করা হয়, অনেকে ওদের বলেন ভাম।

* * *

ভারতের প্রায় সর্বত্র বন-বিড়াল বা জাঙ্গল ক্যাট দেখতে পাওয়া যায়। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, এমন কি গ্রামাঞ্চলের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে দিনের বেলাটা কাটায়। এদের আত্মগোপন করার ক্ষমতা অসাধারণ। জঙ্গলের মধ্যে খাদ্যের আশায় এমন সামান্য স্থানে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে যে কেউ ওদের অবস্থান বুঝতেই পারবে না। গ্রামের পাশে ঝোপেঝাড়ে, গাছের শিকড়ের নিচের গর্তে, ড্রেনের তলে অতি নগণ্য স্থানেই ওরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আত্ম-গোপন করে থাকতে পারে।

রাতে ওদের অসীম সাহস, গৃহস্থের উঠানে এসে ডাক ছাড়বে ম্যাপ্ ম্যাপ্। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে গৃহস্থের সামনে থেকে হাঁস্-মুরগী ধরে নিয়ে পাঁচিল টপকে পালাবে, কারো কিছু করার সাধ্য নেই। বন-বিড়ালের মাথা থেকে শরীরটা লম্বায় দু-ফুটের মত, লেজটা ফুট খানেক। ওজনে সাধারণত পাঁচ-ছ' কেজির মতো হতে পারে। সারা শরীর ধুসর কিম্বা হলদেটে ধুসর লোমে ঢাকা, লেজের গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ, শরীরের নিম্নাংশ ফ্যাকাশে সাদা, সামনের আর পিছনের পায়ের উপরাংশে কাল রংয়ের ঘের দেওয়া। অবশ্য স্থান ও পরিবেশ ভেদে গাত্রবর্ণের

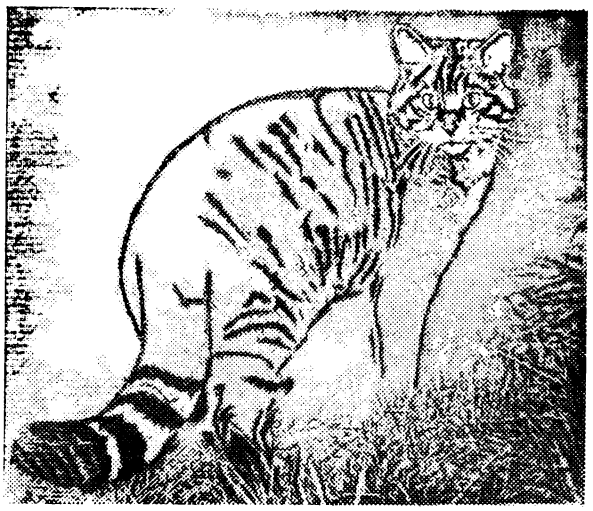

বন-বিড়াল

পরিবর্তন দেখা যায়। ওদের ফ্যাকাশে নীল চোখ দুটো থেকে ক্রুরতা যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ওরা কি খায়? জঙ্গলের মধ্যে মাছ, ব্যাঙ, ইঁদুর, গো-সাপ যাকে বাগে পাবে ছাড়বে না। সুযোগ বুঝলে পাখি ধরেও খায়। কাঁকড়া গিরগিটি কাউকেই ওরা ছাড়বে না। হরিণ-শিশু বা বুনো-শূকরের ছানারা যদি ওদের খপ্পরে পড়ে তবে তাদেরও রেহাই নেই।

সাঁতার কাটতে দারুন পটু এই প্রাণীটা সুন্দরবনের বড় বড় নদী সাঁতার কেটে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে চলে যায়।

* * *

বছরখানেক বাদে মোলীদের সঙ্গে আবার আমাকে বুড়ির-ডাবরিতে যেতে হয়েছিল। গেঁয়োগাছের ধোড়টা দেখেই স্থানটা আমি চিনতে পারলাম। সোড়েলদের ঘরকন্না কেমন চলছে দেখার জন্যে, কাছে গিয়ে যেই না আমি ধোঁড়ের ভেতর টর্চের আলো ফেলেছি, ভেতর থেকে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ ক্রুদ্ধ আওয়াজ পেলাম। দেখলাম বেশ ডাগর ডোগর তিনটে বন-বিড়ালের ছানা, আমার দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে পরের ঘর দখল করে বাঘের-মাসী সুখেই আছেন।

সন্দেশখালী, 24 পরগনা।

বাতাসের কারসাজি

উৎপল চৌধুরী

জলভর্তি গ্লাসের মুখে
পোস্টকার্ডটা ধরে
এক নিমিষে আমার কাকু
দিলেন উপুড় করে।
ও-মা একি অবাক কাণ্ড
পড়ছে না যে জল!
তা হলে কি ভুল দেখছি?
বুঝছি না এ ছল।
ম্যাজিক এটা হতেও পারে
কিংবা মন্ত্রশক্তি
এসব দেখে কাকুর উপর
বাড়লো আমার ভক্তি।

যখন এসব ব্যাপার নিয়ে
ভাবছি একা-একা,
কাকু বলেন, 'দেখলি তো সব
এবার করে দেখা।'
ম্যাজিক কিংবা মন্ত্রশক্তি
নেই যে আমার রপ্ত
দেখাবো কি, তাই তো আমি
ভীষণ অনুতপ্ত!
অবশেষে কাকুই হেসে
বললেন সারমর্ম—
'বাতাসটার ঊর্ধ্ব চাপের
এমনতরোই ধর্ম।'

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-15

তারকমোহন দাস

সালোকসংশ্লেষ কথাটির অর্থ হলো আলোক শক্তির সাহায্যে কোন পদার্থের সংশ্লেষ অর্থাৎ কয়েকটি মূল উপাদানের সাহায্যে একটি জটিল পদার্থ তৈরী হওয়া। গত সংখ্যাতেই বলা হয়েছে সালোকসংশ্লেষের সময় সূর্য-রশ্মির প্রভাবে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের অণুর উপাদানের সাহায্যে গাছের সবুজ অংশে জৈব পদার্থ শর্করা তৈরী হয় এবং অক্সিজেন নিঃসৃত হয়। সূর্যরশ্মির প্রভাবে পৃথিবীর বুকে যত রকম পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে উদ্ভিদের সবুজ পাতায় শর্করার উৎপাদনই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ সৃষ্টির মূল বিক্রিয়াই হলো সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিন্থিসিস্। সালোকসংশ্লেষকে তাই একটি গঠনমূলক বিক্রিয়া (Anabolic reaction) বলা হয়। এই বিক্রিয়ায় পৃথিবীর অতি পরিচিত দুটি অজৈব পদার্থ - বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও মাটির জল মিলিত হয়ে একটি জৈব পদার্থ শর্করার সৃষ্টি করে থাকে। এই শর্করার মধ্যে কিছুটা সৌরশক্তি বাঁধা পড়ে যায়। কারণ এক কিলোগ্রাম শর্করা সম্পূর্ণ দহন করলে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, তার থেকে অনেক কম শক্তি পাওয়া যায় তার প্রাথমিক উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে। সুতরাং শর্করার এই বাড়তি শক্তি অবশ্যই এসেছে সূর্য থেকে।

সালোকসংশ্লেষের সময় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে শর্করা অণুর মধ্যে আবদ্ধ হয়। এই শর্করা পরে উৎসেচকের সাহায্যে শ্বেতসারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ এই শর্করাজাতীয় পদার্থ থেকে নানারকম চর্বিজাতীয় ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ তৈরী করে। এই সব জৈব পদার্থের অধিকাংশই উদ্ভিদ তার নিজের প্রয়োজনে বৃদ্ধি, শ্বসন ইত্যাদিতে খরচ করে থাকে। উদ্বৃত্ত অংশ ফলের মধ্যে, বীজের মধ্যে, মাটির তলার শিকড় বা কাণ্ডের মধ্যে জমিয়ে রাখে বংশবিস্তার বা শিশু-উদ্ভিদের পুষ্টির জন্যে।

আমরাও উদ্ভিদের ঐসমস্ত অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে নিজেদের শরীর-গঠন করে থাকি, শক্তি সংগ্রহ করে থাকি। শুধু আমরা নয়, পৃথিবীর সকাল প্রাণীই খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদের ওপর চিরনির্ভরশীল। খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রাণীদের শরীরে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়, শক্তি সঞ্চারিত হয়। তার ফলে প্রাণিদেহের ওজন ক্রমশ বাড়ে, তারা নানারকম কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীজের হাঁটাচলা, দৌড়া-দৌড়ির ও নানারকম কাজকর্মের জন্যে যে শক্তি ব্যয়িত হয় তা সূর্য থেকেই আসে এই সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে। মানুষ সমেত পৃথিবীর সকল প্রাণীই উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে অনেকটা পরজীবীর মতো। যে সব প্রাণী মাংসভোজী তারাও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। কেননা তারা যে সব প্রাণীর মাংস খায় তারা উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

আমরা যদি বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে হাইড্রোজেন সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে শর্করা তৈরী করতে পারতাম, অর্থাৎ খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে উঠতাম, তা হলেও কিন্তু উদ্ভিদের ওপর আমাদের এই নির্ভরতা আদৌ কমত না। কেননা উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ বিক্রিয়াটিই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন উৎপাদনের প্রধান উৎস। এই অক্সিজেন তৈরী বন্ধ হয়ে গেলে সকল প্রাণীর জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। গত সংখ্যায় আলোচিত প্রিস্টলের বদ্ধ জারের মধ্যে ইঁদুরের মতোই আমাদের অবস্থা হবে। জীবের দিবারাত্র ধরে শ্বাসকার্যের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, সেই সঙ্গে দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকে। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে। তার ফলে বাতাসে ঐ দুটি গ্যাসের সমতা রক্ষিত হয়।

সালোকসংশ্লেষের তাৎপর্য বলতে কি বোঝায়? অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষ ঘটার ফলে জীবজগতের কি সুবিধা হচ্ছে? যদি বোঝবার চেষ্টা কর, তা হলে দেখবে মোটামুটি তিন ভাবে জীবজগতের সুবিধা হচ্ছে। প্রথমত সালোকসংশ্লেষের সময় অজৈব উপাদানের সাহায্যে জৈব পদার্থ শর্করা তৈরী হয়। এই শর্করার মধ্যে কিছুটা সৌরশক্তি বাঁধা পড়ে যায়, যার ওপর নির্ভর করে সমস্ত জীবজগৎ বেঁচে আছে।

দ্বিতীয়ত এই শর্করা যোগে বহু রকম জৈবপদার্থ তৈরী হয়, যেমন চর্বি ও তৈল জাতীয় পদার্থ নাইট্রোজেন ও সালফারের সহযোগে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ ইত্যাদি। পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থের মূল উৎসই হলো এই সালোকসংশ্লেষ। তৃতীয়ত দহন ও শ্বাসকার্যের ফলে বাতাসের উপাদানের যে ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটে সালোক-সংশ্লেষের ফলে তা পূরণ হয়, বাতাসের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ স্থির থাকে।

উদ্ভিদের এই সালোকসংশ্লেষের কথা চিন্তা করলে অনেকগুলি প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠতে পারে। যেমন উদ্ভিদদেহে কোন্ অংশে সালোকসংশ্লেষ হয়? উদ্ভিদের সমস্ত সবুজ অংশেই সালোকসংশ্লেষ হয়। এর মধ্যে অবশ্যই সবুজ পাতা আছে। সবুজ পাতা ছাড়াও ফুলের সবুজ বৃতি, কাণ্ডের সবুজ ডগা এমন কি কয়েক জাতীয় স্পঞ্জ প্যারেনকাইমা কলার মধ্যে প্রধানত সালোকসংশ্লেষ ঘটে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই প্যারেনকাইমা কলার মধ্যে গোল অথবা ডিম্বাকার অতি ছোট ছোট বস্তু রয়েছে, তার নাম ক্লোরোপ্লাস্ট।

সালোকসংশ্লেষের রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণভাবে এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেই ঘটে। এই ক্লোরোপ্লাস্টগুলি উদ্ভিদকোষের মধ্য থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে বাইরে বার করে এনেও দেখা গেছে সালোকসংশ্লেষ ঘটছে ঐ ক্লোরো-প্লাস্টের মধ্যেই।

সবুজ কণা কোথায় থাকে? সবুজ কণার কাজ কি? সবুজ কণার সঙ্গে আর কি রঞ্জককণা থাকে? ক্লোরো-প্লাস্টের মধ্যেই উদ্ভিদের সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল থাকে, যার জন্যে আমরা উদ্ভিদের রং সবুজ দেখি। সবুজ কণার প্রধান কাজ হলো সূর্যরশ্মি শোষণ করা এবং সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করা। ব্যাঙের ছাতা বা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোপ্লাস্ট নেই। তাই সালোকসংশ্লেষ করতে পারে না। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সবুজকণার সঙ্গে ক্যারোটিন ও জ্যানথোফিল নামে আরো দুরকম রঞ্জক কণা আছে, এরাও সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। ক্যারোটিনের রং কমলা এবং জ্যানথোফিলের রং হলদে। গাছের পাতায় সবুজ রং-এর প্রাচুর্য থাকায় এই রং দুটি সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু কোন কারণে সবুজ রংটি নষ্ট হয়ে গেলে এই রং দুটি ফুটে ওঠে। তাই তখন গাছটিকে হলদে দেখায়। ক্যারোটিন থেকে ভিটামিন-A সৃষ্টি হয়। আমাদের দৃষ্টিকে সুস্থ রাখতে হলে এই ভিটামিনটির খুবই প্রয়োজন। গাজরের মধ্যে প্রচুর ক্যারোটিন থাকায় গাজরের রং তাই হলদে। বিমান-চালকদের গাজর খাওয়া অনেকটা বাধ্যতামূলক। ছাত্ররা চোখের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে করে, তাই তাদেরও গাজর খাওয়া দরকার। ডিমের কুসুম ও মাখনের রং ফিকে হলুদ। এর মূল কারণ হলো গরু বা মুর্গী যখন বাইরে চরে খায় তখন ঘাসপাতা থেকে ক্যারোটিন বা এই কমলা রংটি তার দুধে বা ডিমের কুসুমে এসে জমা হয়। যে সব মুর্গী বাইরে চরতে যায় না, যথেষ্ট সবুজ সবজি খায় না, তাদের ডিমের কুসুমের রং সাদা। এই কারণে পোলট্রির মুর্গীর ডিমের কুসুমের রং সাধারণত সাদা হয়ে থাকে। যথেষ্ট ক্যারোটিন না থাকার জন্যেই এটা হয়।

সালোকসংশ্লেষের শর্ত বা সালোকসংশ্লেষ ঘটার জন্যে যে উপাদানগুলির দরকার তা হলো (1) কার্বন ডাইঅক্সাইড, অধিকাংশ উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়। জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড নেয়। (2) জল। (3) সূর্যালোক, প্রখর বৈদ্যুতিক আলোতেও সালোক সংশ্লেষ হতে পারে। (4) ক্লোরোপ্লাস্ট – যার মধ্যে ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন, জ্যানথোফিল প্রভৃতি সালোকসংশ্লেষে অংশগ্রহণকারী রঞ্জক কণা থাকে এবং বিবিধরকম উৎসেচক থাকে। সালোকসংশ্লেষ ঘটার জন্যে এই চারটি শর্তের একযোগে উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর কোন একটির অভাব হলে সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সালোকসংশ্লেষের শেষে যে দুটি পদার্থ উৎপন্ন হয় তা হলো গ্লুকোজ শর্করা ও অক্সিজেন। গ্লুকোজ শর্করার উপাদান হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ, 35 বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-19।

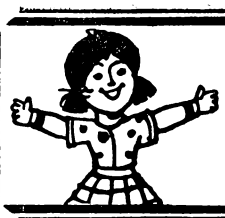

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা জুন-'83 সংখ্যার যারা দশ বা তার বেশী প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের নাম প্রকাশিত হল।

ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকায় সঠিক উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও অনেকের নাম মুদ্রিত করা সম্ভব হলো না, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণনাম-ঠিকানা লিখে পাঠাবে।

কলকাতা ঃ প্রণবকুমার সরকার, সুপর্ণা সরকার, রুমকি সরকার, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ লাহিড়ী, দিব্যেন্দু পানিগ্রাহী, জ্ঞানপ্রকাশ মজুমদার, হিমাদ্রিশেখর আদিত্যচৌধুরী, সুমন দাশ, দিব্যেন্দুনারায়ণ লাহিড়ী, পুষ্পেন্দুনারায়ণ লাহিড়ী, অজয়েশ ঘোষাল, মলয় দাশ, শৌভিক চ্যাটার্জী, শৌভিক ও কৌশিক নন্দী।

24-পরগনা ঃ প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, গৌতম ঘোষ, সঞ্জয়কুমার হালদার, উৎপল বিশ্বাস, জয়গোপাল দে, নীতা পাঁজা, সৌমিত্র মজুমদার, গৌতম পাল, টুকুন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু রায়, সুব্রতকুমার করণ, চন্দন দেব, অশোককুমার মজুমদার, মোঃ রেজাউল হক্, সৌমেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুমিতা মজুমদার, রাণ্টু মজুমদার, তাপস সিংহ, ব্রজগোপাল সাহা, নির্মলকান্তি নাথ, অরূপকুমার সাহা, গৌতম শাসমল, সপ্তর্ষি মিত্র, স্মৃতিকণা কর, পার্বতী মুখোপাধ্যায়, সমীরণ বিশ্বাস, সুগত দত্ত।

হাওড়া ঃ তাপস রীত, মানসীরাণী রীত, অমিতাভ মান্না, গৌতম জানা, হাবুকুমার দাস, দেবকুমার দে, বন্দনা দে, দুলাল, দীপ্তি, রত্না ভট্টাচার্য, অসীম সরকার, শোভা সরকার, অজিত চ্যাটার্জী, চঞ্চল মান্না।

হুগলী ঃ শুভাশিষ ঘোষ, বিশ্বনাথ সামন্ত, প্রলয় চক্রবর্তী, শুভেন্দু মুখার্জী, জয়ন্ত মুখার্জী, রাজর্ষি পালিত, বিপ্লব ব্যানার্জী, সঞ্জয় দাস, কুনাল সেনগুপ্ত, মঞ্জরী কুণ্ডু, অভিজিৎ দত্ত, সনজিৎ দত্ত, যমুনা শীল, অনুসীমা শীল, দিবেন্দু কুণ্ডু।

বর্ধমান ঃ সুব্রত ঘোষ, রবিব্রত ঘোষ, অতীন্দ্রনাথ মিশ্র, কৃষ্ণগোপাল সেন, দিলীপ গোস্বামী, বাপী, কেয়া, শিল্পী, দীপক পোদ্দার, মৃত্যুঞ্জয় পাল, অরুণকুমার সিংহ, তরুণকুমার সিংহ, বরুণকুমার সিংহ, নন্দিতা ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, শুভজিৎ সামন্ত, বিশ্বজিৎ সামন্ত, সুবীর দাস, অরুণ দত্ত, হিরণ্ময় গুহ, ফাল্গুনী দাস, প্রান্তিক চক্রবর্তী, সুরজিৎ কুণ্ডু।

মেদিনীপুর ঃ দেবাশিষ পট্টনায়ক, মাধবী রায়, তুষার দত্ত, উৎপল দত্ত, শঙ্করপ্রসাদ অধিকারী, স্বপন অধিকারী, প্রভাতকুমার গিরি, ধূর্জটিপ্রসাদ সাহু, শাশ্বতী অধিকারী, অসীম দাশ, সুজিৎ মাহাত, দিলীপ মাহাত, অমিয় কারক, সাত্বিকপ্রসূন বেরা, গোপাল সিংহ, বাসুদেব দত্ত, রণজিৎ সিংহ, শুভাশিস দে, সুরঞ্জন ভৌমিক, রামচন্দ্র সামন্ত, শুভব্রত হালদার, ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, কিংশুক হালদার, সুচরিতা মিশ্র, চম্পক মিশ্র তপন অধিকারী।

নদীয়া ঃ পল্লব মোহান্ত, মলয় মোহান্ত, স্নেহাশীষ মোহান্ত, সুজিতকুমার খাঁ।

পুরুলিয়া ঃ সুমন ঘোষ, রিম্‌ঝিম্ সুর, সুব্রতকুমার কর।

জলপাইগুড়ি ঃ জয়জিৎ লাহিড়ী।

মুর্শিদাবাদ ঃ সমরজিৎ সরকার, অভিজিৎ সরকার, বশীর, বিবেকানন্দ সরকার, সুব্রত চ্যাটার্জী, বৈশাখী চ্যাটার্জী, চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, রোজারিও টমাস, পলাশ মোহান্ত, বিকাশ মোহান্ত, মানস মোহান্ত, হাসিনা, আলির, আলী আকবর, নাসিরউদ্দীন।

বীরভুম ঃ
দীপনারায়ণ দত্ত, সুমিতা, গোপা, রাজা ঘোষ, রত্না।

বাঁকুড়া ঃ
বিষ্ণু বাসিয়া, রঘুনাথ, শ্যাম, প্রদীপ, বিমান, অজিত।

আসাম ঃ
লামডিং ॥ রিজু বরা।

ডিব্রুগড় ঃ রজত দাস, রাহুল দাস, দেবাশিষ হালদার, উজ্জ্বল দাস।

প্রশ্নোত্তর

1. প্রঃ—ক্যানসার কি সারে না? এই রোগ অত্যধিক দ্রুত বিস্তার লাভ করে কেন?

শর্মিষ্ঠা অধিকারী, শ্রীরামপুর, হুগলী।

উঃ সাধারণত রোগ সারা বলতে আমরা বুঝি, যে সকল লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে সেটি শুরু হয়, চিকিৎসার পর সেসব লক্ষণ ও উপসর্গ সম্পূর্ণ উপশম হওয়া। কিন্তু ক্যানসার একেবারে সেরে গেছে বলা যায় না। তা হলেও কোনো কোনো ক্যানসার গামারশ্মি প্রয়োগে বা রাসায়নিক ওষুধ দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে নিরাময় হতে দেখা যায়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে। এই রোগ দ্রুত বিস্তারের কারণ, ক্যানসার কোষগুলি রক্তবাহী নালীতে বাহিত হয়ে শরীরের যে কোনো যন্ত্রে প্রোথিত হলে সেখানে ঐ কোষ বা কোষগুলি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে।

2. প্রঃ—ভয় পেলে বা গায়ে ঠাণ্ডা লাগলে কাঁটা দেয় কেন? এটি কি কোনো রোগ?

শিবাজী মিত্র, কণিষ্ক রোড, দুর্গাপুর-4.

উঃ—ভয় পেলে বা ঠাণ্ডা লাগলে ত্বকের স্নায়ু কলা উত্তেজিত হয়ে একপ্রকার প্রতিবর্ত সৃষ্টি করে, যার ফলে রোমগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। এটি কোনো রোগ নয়, স্বাভাবিক শারীরিক প্রতিক্রিয়া।

3. প্রঃ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত গ্রহ বা উপগ্রহ আছে, সেগুলি গোলাকার কেন? গোলাকার নয় এমন কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ আছে কি?

দেবাজিৎ ধর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

উঃ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত গ্রহ বা উপগ্রহ আছে, সেগুলি সবই আবর্তনশীল। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে এবং যেসব গ্রহের উপগ্রহ আছে তাদের কেন্দ্র করেই উপগ্রহগুলি ঘোরে। আবর্তন-ধর্মের দরুন জড়পিণ্ড সবসময় বর্তুলাকার ধারণ করতে চায় এবং সে কারণেই সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ গোলাকার। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গোলাকার নয় এমন কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ আছে বলে জানা নেই।

লাঙ্-ফিশ

বিপ্লব সরকার

লাঙ্-ফিশ হলো এক অদ্ভুত ধরনের মাছ। বাংলায় একে বলে ফুসফুস মাছ। সাধারণ মাছের থেকে এদের ফুসফুসটা একটু অন্য রকমের। নামের রহস্যটা এখানেই। কাদাতেও থাকে বলে এদেরকে অনেক সময় কাদা মাছও (মাড ফিশ) বলা হয়। সাধারণ মাছেরা জলের বাইরে এলেই মরে যায়। অবশ্য কই, মাগুর শিঙি প্রভৃতি মাছ ডাঙায় কিছুক্ষণের জন্যে বেঁচে থাকে তাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের দৌলতে। কিন্তু ফুসফুস মাছেরা বেঁচে থাকে অনেকক্ষণ। এই বেঁচে থাকার জন্যে দায়ী হলো তাদের বৈচিত্র্যময় ফুসফুস। ভাবতে অবাক লাগে বিধাতার কি অপূর্ব সৃষ্টি মাছ তার বিচরণভূমি জল ছেড়ে এসে, ডাঙাতেও বেঁচে রয়েছে। হ্যাঁ, জাতে মাছ হলেও এরা কিন্তু একটু উন্নততর প্রজাতি। কেননা বিবর্তনের ধারায় এরা নিজেদেরকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত করেছে। জলাভূমির পরিবেশে থাকলেও অবস্থাবিশেষে কর্দমময় স্থলভূমিতেও এদেরকে জীবন কাটাতে হয়। তাই বাঁচবার তাগিদে এদের ফুসফুসটা অন্য মাছের থেকে একটু অদ্ভুত ধরনের। জলের মধ্যে এরা সাধারণ মাছের মতোই কানকো দিয়ে জলমিশ্রিত অক্সিজেন গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো 'বায়ু-থলি'। এই থলি স্থলভূমির প্রাণীদের ফুসফুসের মতো কাজ করে, যখন এরা ডাঙায় আসে।

এই শ্রেণীর মাছ মধ্য আফ্রিকা ও বিষুব অঞ্চলের দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়। যে কারণের জন্যে ফুসফুসের এত বিশেষত্ব, সেই বিশেষ পরিবেশেই এদেরকে দেখা যায়। তবে এই শ্রেণীর মাছেদের এক এক জায়গায় এক এক রকম নাম। যেমন, মধ্য আফ্রিকায় এই শ্রেণীর মাছকে বলা হয়, প্রোটোপটেরাস অ্যানেকটান্স—দৈর্ঘ্যে এরা প্রায় ছ-ফুটের কাছাকাছি। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় এদেরকে বলা হয় লেপিডোসাইরেন প্যারাডোক্সা—দৈর্ঘ্যে প্রায় চার ফুট। এখন দেখা যাক, এইসব মাছেরা কিভাবে বেঁচে থাকে। গ্রীষ্মকালে যখন এইসব অঞ্চলে জলাভূমির জল শুকিয়ে যায়, তখন এরা কাদার মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরী করে একেবারে তলায় চলে যায়। ব্যস, তখনই চালু হয়ে যায় বায়ু-থলি। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বাতাস বায়ু-থলিতে পৌঁছায়। যতদিন না বৃষ্টি আসে, ততদিন এরা সুড়ঙ্গের তলদেশে সরীসৃপের শীতঘুমের মতো ঘুমিয়ে থাকে। আর বর্ষাকালে এদের জলের মধ্যে কানকো শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কাজ করে।

গুমা, সুকান্তপল্লী, 24-পরগনা।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

গাছের মূল্য ● সোনালী মণ্ডল (৪ম)

আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি তবে আমরা আমাদের জীবনে গাছের মূল্য বুঝতে পারব। গাছের মূল্য তো কেবল তার কাঠ ও জ্বালানীর দামে নয়, আরো আরো অনেক কিছু। আমরা তো আমাদের যে কোনোরকম খাদ্য—কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ, ভিটামিন, প্রোটিন সমস্তই পাই উদ্ভিদ থেকে। এমন কি মাংসাশী প্রাণীরাও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। কারণ মাংসাশী প্রাণীরা তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এ তো গেল খাদ্যের কথা, আমাদের সভ্যতায় বস্ত্র, কাগজ, ঔষধ, গৃহনির্মাণ, যানবাহন ও আসবাবপত্র প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎস গাছ। সুতরাং এদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কেবল তাই নয় কার্বন, নাইট্রোজেন অক্সিজেন আবর্তনে অর্থাৎ বায়ুর প্রয়োজনীয় উপাদানের অনুপাত রক্ষায় উদ্ভিদের ভূমিকা অনবদ্য। এখন আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা যদি গাছের মূল্য দেখি তবে তার দাম 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা। এটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি একটা পঞ্চাশ টনের পঞ্চাশ বছরের গাছ যে অক্সিজেন তৈরী করে তার দাম 2,50,000 টাকা, প্রোটিন দেয় 20,000 টাকার, মাটির ক্ষয় রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে তার দাম 2,50,000 টাকা, জলের আবর্তন চক্র ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ তার দাম 300,000 টাকা, পাখি, পোকামাকড়, জীবজন্তু, ও অন্যান্য উদ্ভিদের আশ্রয় হিসাবে 2,50,000 টাকা, আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ 5,00,000 টাকা। মোট 15,70,000 টাকা। এতো অর্থনৈতিক মূল্য। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মূল্য নয়। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্পোন্নয়নের মূল উপকরণ কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি প্রস্তুরীভূত উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত হয়। পরিবেশের অন্যতম উপাদান বায়ুর অক্সিজেনের জন্যেও প্রাণিজগৎ সমভাবে উদ্ভিদজগতের উপর একান্ত নির্ভরশীল। শ্বাসক্রিয়ায় নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও বিবিধ কারণে জৈব বস্তুর দহনে পরিবেশের বায়ু যখন দূষিত ও বিষময় হয়ে ওঠে তখন একমাত্র সবুজ উদ্ভিদই অক্সিজেন প্রস্তুত করে প্রাণিজগতকে মৃত্যু হতে রক্ষা করে। বন্যা প্রতিরোধ, ভূমিক্ষয় রোধ, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের রোগজনিত মৃত্যুও উদ্ভিদ অনেকাংশে কমিয়েছে, আমাদের বহু দুরারোগ্য ব্যাধির বিভিন্ন ঔষধ উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত করি। এইভাবে উদ্ভিদ যে কত দিক থেকে কিভাবে নিস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়!

বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের এই উপলব্ধি বনমহোৎসব পরিকল্পনা-বৃক্ষরোপণ—পরিবেশকে রক্ষার এই অভিনব পন্থা। সত্যি, গাছের মূল্য অসীম!

ব্রতচারী বৈদ্যাশ্রম ফর গার্লস, জোকা।

শব্দকূট

অমিতাভ সোম

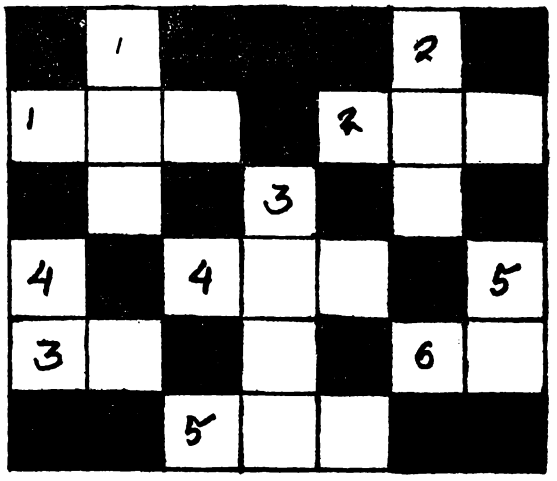

সূত্র ঃ পাশাপাশি ঃ 1. তড়িৎ পরিমাপের একক। 2. যে এককে হীরক মাপা হয়। 3. ভরের ব্যবহারিক বৃহত্তম একক। 4. এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে ভরের একক। 5. সি, জি, এস পদ্ধতিতে ঔজ্জ্বল্যের একক। 6. দীপনমাত্রার একক।

উপর-নীচ ঃ 1. সি, জি, এস পদ্ধতিতে তাপের একক। 2. ধারকত্বের ব্যবহারিক একক। 3. বলের এফ, পি, এস পদ্ধতিতে একক। 4. এম, কে, এস পদ্ধতিতে ঔজ্জ্বল্যের একক। 5. এফ, পি, এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক।

গ্রাম + পোঃ – নেগুয়া, মেদিনীপুর।

গত সংখ্যার শব্দকূটের উত্তর ঃ

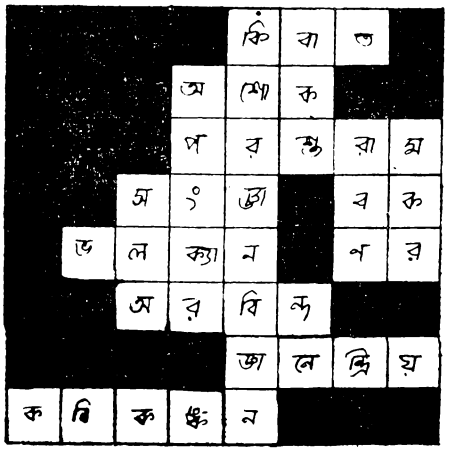

ভেবে ভেবে বল ● শুভব্রত রায়চৌধুরী

1. ডোবা পুকুর বা ঝিলের জলে এক প্রকার সবুজ কার্পেটের মতো ভাসমান পানার ভেতর থেকে পাতি হাঁসরা এক ধরনের খাবার সংগ্রহ করে খায়। খাবারটির কি নাম ভেবে বলো।

2. সিকোয়া গাছ, পাইন গাছ, বট গাছ, নারকেল গাছ প্রভৃতি এদের মধ্যে সব থেকে বড় গাছ কোন্‌টি ?

3. অ্যালুমিনিয়াম, তামা, সীসা এবং দস্তা এই চারটি ধাতুর মধ্যে কোন্ ধাতুটি সব থেকে বেশি নরম বল তো ?

4. ঠোঁট আছে লম্বা তাহার, কেঁচো পোকা সবই আহার।

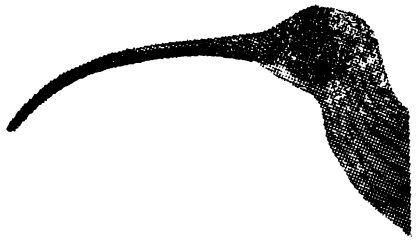

পাখিটার নাম কি বল ?

5. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোন্ তারিখে পালন করা হয়।

6. নিচের ছবিতে মোট আটটি বর্গক্ষেত্র ও মোট চারটি গোলক আছে। 1-12টি সংখ্যা এমনভাবে সাজাও যাতে বর্গক্ষেত্রের মধ্যে সংখ্যাগুলির সমষ্টিগত যোগফল গোলকের মধ্যে সংখ্যাগুলির সমষ্টিত যোগফলের দ্বিগুণ হয়।

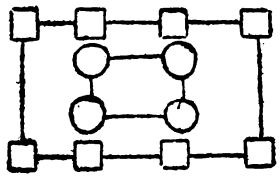

7. আমাদের শরীরে যে হাড় আছে ; এই হাড়ের মধ্যে সব থেকে বড়ো কোন্‌টি ?

8. কোন্ জাতীয় পদার্থ দুধের মিষ্টি স্বাদ প্রদান করে ?

104, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-8

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর ঃ

1. উলফিয়া আরহিজা 2. সিকোয়া গাছ 3. সীসা 4. 'কারলিউ পাখী' 5. প্রতিবছর 5 জুন

6.

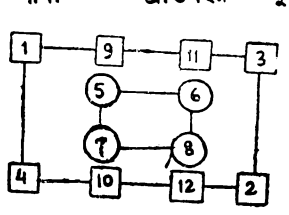

7. ফেমুর (Femur) 8. 'ল্যাকটোজ' (Lactose)

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ● অমরনাথ রায়

1. ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়মে মধ্যমা আঙ্গুলটি কি নির্দেশ করে ?
2. অঙ্কুরিত ছোলায় কোন্ ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে ?
3. পশম দিয়ে একটি কাচদণ্ডকে ঘষলে কাচদণ্ডে কোন্ প্রকৃতির তড়িৎ উৎপন্ন হয় ?
4. 'স্ট্যালয়'-এর উপাদান কি ?
5. যে উষ্ণতায় চুম্বকের চৌম্বক ধর্ম পুরোপুরি নষ্ট হ'য়ে যায় সেই উষ্ণতাকে কি বলে ?
6. যখন ক্রুকস-এর অন্ধকার স্থান সৃষ্টি হয় তখন ক্ষরণ নলের মধ্যে বায়ুর চাপ কত থাকে ?
7. কোন্ নীতির ফলে ডায়নামোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ?
8. রূপা ও প্লাটিনামের মধ্যে তাপগ্রাহিতা বেশি কার ?
9. 'থার্মোকাপ্‌ল'-এর সংযোগস্থলে উষ্ণতার পার্থক্য হলে তারের মধ্যে যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তার নাম কি ?
10. তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু থেকে আলফা কণা বেরিয়ে গেলে মৌলটির পরমাণু ক্রমাংক বাড়ে না কমে ?
11. ইলেকট্রন, প্রোটন ও মেসন-এর মধ্যে কোন্‌টি বেশি ভারি ?
12. রূপা ও প্লাটিনামের মধ্যে রোধাঙ্ক কার বেশি ?
13. দেহের সবচেয়ে বড় পাচক গ্রন্থিটির নাম কি ?
14. নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর সমুদ্র উপকূল কোন্ মাছের জন্যে বিশ্ববিখ্যাত ?
15. বছরে সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক ক'টি সূর্যগ্রহণ সম্ভব ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায়)

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা 'জুলাই-83' এর সমাধান

1. না। 2. জৈব পদার্থ। 3. গুটিপোকার লার্ভা-গুলি রেশমের তন্তু দিয়ে নিজেদের আষ্টে-পৃষ্ঠে আবৃত করে। এই আবরণীকে 'কোকুন' বলে। 4. তরল খাদ্য গ্রহণ করে। 5. কতকগুলি উদ্ভিদে পত্রমূলের দু'পাশে সরু সরু পাতার মতো অঙ্গ দেখা যায়। ঐগুলিকে উপপত্র বলে। 6. অক্ষদণ্ডের মতো ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক বেগ মাপবার যন্ত্র। 7. এমু, রিয়া ও উটপাখির ডানা দুর্বল। 8. শব্দের তীব্রতা মাপবার প্রচলিত একক। 9. টংস্টেন এর অপর নাম উলফ্রাম (Wolfram)। 10. হ্যাঁ, স্থিতিশক্তি সঞ্চিত থাকলো। 11. ফোরিয়াম। 12. বৈদ্যুতিক মোটর ও ডায়নামোতে ধাতব তার জড়ানো যে যন্ত্রাংশ থাকে, তারই নাম 'আর্মেচার'। 13. 'প্লাস' প্রথম শ্রেণীর লিভার। 14. Grizzly Bear. 15. ছাগলের চামড়া।

রচনা • গাছের মূল্য

সুজয় দত্ত (৪ম) দ্বিতীয়

সেদিন রথের মেলায় গিয়ে এক শৌখীন ভদ্রলোককে একটি সবুজ ও সতেজ লিচুগাছের চারা নিয়ে চাষীর সঙ্গে দরাদরি করতে দেখলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম, 'কতই বা আর দাম হবে এই একরত্তি গাছটার'। সেই ভদ্রলোক হয়তো অশিক্ষিত-চাষীকে কথায় ভুলিয়ে চারাগাছটি নিতান্তই অল্প দামে কিনে নিলেন। কিন্তু ভেবে দেখুন তো প্রকৃতপক্ষে সেই চারাটির মূল্য কতই বা হতে পারে। একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে এক্ষেত্রে চারাগাছটির প্রকৃত-মূল্যের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় নি। বাস্তবিকই. বিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র-শৈবাল পর্যন্ত অসংখ্য বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রতিনিধির সমন্বয় এই উদ্ভিদকূল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জৈব ও অজৈব জগতের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র রক্ষা করে আমাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি প্রাথমিক-প্রয়োজনের তথা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির যে ভিত্তিমূল রচনা করেছে, তার সার্থকতা ও উপযোগিতা নিরূপণ করে গাছের সঠিক মূল্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে উদ্ভিদজগৎ, আমাদের তথা সমগ্র প্রাণিজগতের প্রতি যে অকৃত্রিম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তারই মুষ্টিমেয় উদাহরণ আমার রচনায় উপস্থাপিত করলাম।

জীবদেহে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল। কথায় বলে, 'We must eat to live.' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল প্রয়োজনীয় ও অবশ্য-করণীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে দরকারী শক্তি আমরা পাই খাদ্য থেকে। আমরা, প্রাণীরা খাদ্যকে তার বিভিন্ন উপাদান থেকে গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে অক্ষম। সবুজ-উদ্ভিদই প্রাণীদের এই অক্ষমতাকে অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে। তারাই সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিরূপে সংরক্ষিত করে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ রাখে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবজগতের পরিপোষণে নিয়োজিত হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে উৎপন্ন গ্লুকোজ, প্রোটিন-ফ্যাট-শর্করা প্রভৃতি খাদ্যোপাদানের মূল। উদ্ভিদের উৎপাদন করা খাদ্যের 25-40% আমাদের গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে জলজ উদ্ভিদ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রভূত খাদ্যগুণসম্পন্ন খাদ্যোপাদান উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে।

বর্তমানে পরিবেশ দূষণ একটি বড় সমস্যা। বর্তমান সভ্যতাই মুখ্যত পরিবেশকে ক্লেদযুক্ত করে। উদ্ভিদ পরিবেশ-দূষণ রোধ করতে সাহায্য করে। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করে এবং সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অক্সিজেন ছেড়ে দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিবেশের তিন প্রধান অঙ্গ জল-মাটি-বায়ুকে উদ্ভিদ অবিকৃত রাখতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে মাটির ক্ষয়সাধনকে উদ্ভিদ রদ করতে সাহায্য করে, উদ্ভিদের আধিক্য জলীয়-বাষ্পকে বৃষ্টি ফোঁটায় পরিণত করে মাটিতে নামিয়ে এনে ভূমিকে সুজলা-সুফলা ও উর্বরা করে তোলে।

বর্তমানের যান্ত্রিক সভ্যতাকে সচল রাখতে চাই শক্তি, যা আমরা পাই জ্বালানী থেকে। কয়লা হলো প্রস্তরীভূত উদ্ভিদদেহ, পেট্রোলিয়ামও পরোক্ষভাবে ভূনিম্নস্থ উদ্ভিদ থেকে আহরিত হয়। তবে এই সকল বহুলব্যবহৃত জ্বালানীর দিনও ফুরিয়ে আসছে, পরিবর্ত হিসাবে সৌর-শক্তির কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বর্তমানে যদিও নানা বিজ্ঞানসম্মত ও অভিনব প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি আহরণের চেষ্টা হচ্ছে, তবুও প্রতিদিন যে পরিমাণ সূর্যালোক পৃথিবীতে পতিত হয়, তার কয়েক শতাংশ মাত্র আমাদের কাজে লাগে এবং তাও প্রধানতঃ উদ্ভিদের মাধ্যমে। কারণ, অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার সূর্য থেকে নির্গত শক্তি বহুক্ষেত্রে আমরা সরাসরি আহরণ করতে পারি না, পাই উদ্ভিদের মাধ্যমে। সম্প্রতি জলজ কচুরীপানা থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টাটিও উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও আমাদের আধুনিক দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচিত কয়েকটি নাম রবার, প্লাস্টিক, রেয়ন, নাইলন, সেলুলোজ, অ্যালকোহল প্রভৃতি উদ্ভিদের শর্করাজাতীয় উপাদানেরই পরোক্ষ অবদান। সবশেষে বলি বর্তমানে ক্রমবিলুপ্ত হতে থাকা বনসম্পদের কথা। সত্যি, একটা আদর্শ ও সমৃদ্ধ অরণ্য থেকে আমরা কিনা পাই। বনরাজি যেমন অনেকের বিবিধ প্রয়োজনের অবসান ঘটায়, সেরকমই অনেক নিম্নবিত্তের জীবিকানির্বাহের পথ প্রশস্ত করে।

সেই কারণেই বনবিভাগের কর্তৃপক্ষরা সকলকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে উদ্ভিদ জগতের ক্রমবিনাশ রোধ করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন।

কিন্তু তাঁদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাঁদের প্রতি অনুরোধ, শখের বাগানটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে কিংবা একটি সুদৃশ্য বাগানবাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে যে পরিমাণ গাছের প্রাণনাশ করছেন, তার মূল্য আমাদের সকলের জীবনে অনেক—অনেক বেশি। যে উদ্ভিদজগৎ সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রাণিজগতের অমূল্য সম্পদ ও রক্ষাকবচস্বরূপ, নির্দ্বিধায় তার নিধন করার আগে একটু ভেবে দেখুন।

গভঃ স্পন্‌সর্ড মাল্টিপার্পস স্কুল ফর বয়েজ, টাকী হাউস, কলকাতা-9,

রচনা • গাছের মূল্য

মৃগাঙ্কমৌলি দেব (৪ম) তৃতীয়

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—Familiarity breeds contempt' খুব পরিচিত যা, তার কদর আমরা অনেক সময় দেই না। গাছের বেলায়ও হয়েছে ঠিক সেই ব্যাপার। আমাদের দেশে চলতে ফিরতে দেখি শুধু গাছ আর গাছ—দেখতে বড় ছোট মাঝারী বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতের। ঠিক মরুদেশের বা সাগরের উল্টো। মরুভূমিতে দেখা যায় শুধু বালু আর বালু আর সাগরে দেখা যায় শুধু জল আর জল। লোকসংখ্যা এদিকে বেড়ে চলেছে। জনপথ উঠছে গড়ে বাসস্থানের প্রয়োজনে। বৃক্ষের ধ্বংসসাধন চলেছে অনিবার্যভাবেই। এতে যে বিপদ নিহিত রয়েছে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় 'বৃক্ষ বাঁচাও' আন্দোলনের মধ্যে, আমাদের দেশে বনমহোৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যে।

বস্তুত জলের আরেক নাম 'জীবন'। গাছের আরেক নাম 'জীবন' বললেও অত্যুক্তি হবে না সামগ্রিক খতিয়ে দেখলে। বেঁচে থাকার জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বায়ুতে যে অক্সিজেন আছে প্রশ্বাসে তা আমরা গ্রহণ করি। নিশ্বাস রূপে ত্যাগ করি কার্বন-ডাই-অক্সাইড —যা হচ্ছে অক্সিজেন ও কার্বনের যৌগ। গাছ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় জলকে বিশ্লিষ্ট করে অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয় তা না হলে অক্সিজেনের অভাবে পৃথিবীটা হয়ে যেত সিরাজউদ্দৌলার আমলের অন্ধকূপের মত এবং জীবজন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত অক্সিজেনের অভাবে। খাদ্যের জন্যে প্রাণীমাত্রই গাছের উপর নির্ভরশীল। পশু, পাখী প্রত্যেককেই খাদ্য গাছ সরবরাহ করে থাকে। মানুষ আমিষ জাতীয় খাদ্যের জন্যে পরোক্ষভাবে ঋণী গাছের কাছে। নিরামিষ খাদ্য—যা শাকসব্‌জি তরিতরকারী থেকে মানুষ সংগ্রহ করে তার উপাদান তো গাছগাছড়াই।

মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতি হচ্ছে দিনকে দিন। যখন মানুষ কৃষিকাজ জানত না তখন সে খেত ফলমূল—বা শিকার করা বন্যপশু। রান্নার কলাকৌশল ছিল তার অজ্ঞাত। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সে শিখলো রান্না। রান্নার জন্যে দরকার আগুন সভ্যতার ঊষালগ্নে সে গাছের মারফতেই আবিষ্কার করেছিলো। এই যাযাবর যুগে আগুনকে কাজে লাগিয়ে বন্য পশুপাখী আগুনে ঝলসিয়ে কাঁচামাংসের উপাদেয়তা বাড়িয়ে তুলত। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মানুষ আজ বিদ্যুতের ব্যবস্থা শিখেছে, কয়লা শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। কথায় বলে মরা হাতি লাখ টাকা। কয়লা কি? কোটি কোটি বছর মাটির নিচে চাপা গাছেরই রূপান্তর। আধুনিক সভ্যতার আলকাতরা, গ্র্যাফাইট, হীরা ইত্যাদি গাছেরই বিভিন্ন রূপান্তর। কাগজের অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে গাছ। ব্যবসা বাণিজ্যে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলগাড়ির ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রেলগাড়ির কামরা, তৈরীতে কাঠই ব্যবহৃত হয়। ইঞ্জিনের বায়ুশক্তি যোগানও পূর্বে কয়লাই ব্যবহৃত হত বেশি। বর্তমানে ডিজেল সঙ্কটের যুগে কয়লা আবার তার পূর্ব গৌরব ফিরে পেতে বসেছে ভারতে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পরোক্ষভাবে গাছের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল জীবন রক্ষায়। গাছ ছাড়া এক পা এগোবার উপায় নেই। রামায়ণের যুগের বিশল্যকরণীর কথা শুনেছি। শক্তি-শেল-আহত মৃত্যু পথযাত্রী লক্ষ্মণের জীবন দান করেছিলো বিশল্যকরণী। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যাবতীয় ওষুধ গাছগাছড়াই দান করে থাকে। রোগীর পথ্য হিসেবে আঙ্গুর, বেদানা প্রভৃতি ফলের তুলনা কোথায়? যে জলকে আমরা জীবন রূপে আখ্যায়িত করি তা আমরা গাছগাছড়ার জন্যেই পেয়ে থাকি। বৃষ্টিপাত অনেক ক্ষেত্রেই গাছগাছড়া ঘটিয়ে থাকে। নদী, খাল, বিল-এর জল বাষ্পায়িত হয়ে পৃথিবী-ছাড়া হয় সাময়িক-ভাবে মাত্র। কিন্তু গাছপালার দৌলতেই ফিরে আসে পৃথিবীর আশীষ রূপে। ভূমিক্ষয় নিবারণও করে থাকে গাছপালা অনেকাংশে। গাছের শিকড় দূরবিস্তৃত হয়ে মাটি আঁকড়ে থাকে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে থাকে। আমাদের দেশের দরিদ্র জনের ঘরবাড়ি সাজসরঞ্জাম বাঁশ, বেত, খড় সবই ত গাছ থেকে আসে।

চক্ষু মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শহরাঞ্চলে চোখের রোগের এত প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ গাছগাছড়ার অভাব। মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যানুরাগী। পশুর মতো খাদ্য সংস্থান করেই সে কেবল সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কথায় বলে—Man cannot live by bread alone. ছবি, গান তার সৌন্দর্যবোধকে করে তৃপ্ত, আনন্দরস লোকে করে উত্তীর্ণ তার মনকে। আনন্দ তৃপ্তি দান করতে গাছের জুড়ই কমে আছে। সবুজের সমারোহ চোখের কিইনা আনন্দদায়ক। ফুলের কদরও এজন্যেই। যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, বিবাহে ফুল ত অপরিহার্য। গৃহের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বর্তমান সভ্যতার যুগেও বৃক্ষেই যোগান দিয়ে থাকে বেশি। ভূমিকম্পপ্রধান অঞ্চলে কাঠের গৃহ অপরিহার্য।

বিদেশী মুদ্রা অর্জনেও বৃক্ষের স্থান উল্লেখযোগ্য। নরওয়ে, সুইডেনের সমৃদ্ধিকে বৃক্ষ অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

দেখা গেল, মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বৃক্ষের বৃদ্ধি পরিচর্যায় যত্নবান হওয়া আজকের দিনে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই একান্ত প্রয়োজন।

আলগাগুর, উত্তর ত্রিপুরা

স্বয়ং সঙ্কেতজ্ঞাপক চিঠির বাক্স ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত

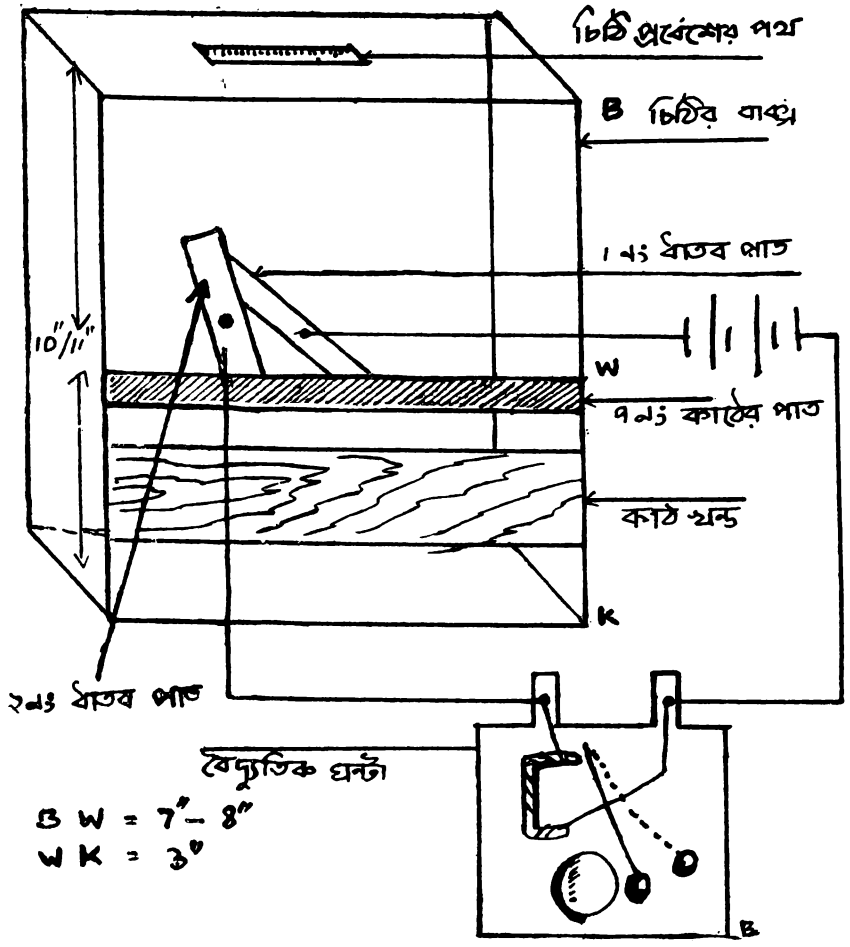

খুব কম খরচায় এবং অল্প পরিশ্রমে বাড়িতে ব্যবহারোপযোগী একটি মডেলের কথা বলছি। বাক্সে ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেলে একটি বৈদ্যুতিক ঘন্টা বাজিয়ে আমাদের জানিয়ে দেবে যে, আমাদের চিঠি এসেছে।

প্রথমেই 10''—1'' লম্বা কাঠের একটি চিঠির বাক্স। চিঠি ফেলার পথটি কিন্তু বাক্সের উপরদিকে থাকবে এবং এই প,থ কিন্তু খুব একটা বড় করবে না, এই বার চিত্রের ন্যায়, বাক্সের দরজার দিকে একটি বা দুইটি কাঠ লাগিয়ে নাও। এইবার তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম এরূপ ধাতুর দুটি পাতলা পাত নাও। পাতগুলি যেন অল্প চওড়া হয়। উপরে যে কাঠ দুটিকে বাক্সের দেয়ালে (দরজার দিকে) লাগাতে বলা হয়েছে তা যেন চিঠির প্রবেশপথ থেকে 7'' নিচে থাকে। এইবার ঐ ধাতব পাত দুটিকে a নং কাঠের সঙ্গে ছোট পেরেকের মাধ্যমে এরূপে লাগিয়ে দাও যেন সাধারণ অবস্থায় পাতদুটি কখনই একে অপরকে স্পর্শ করে না থাকে। [চিত্র দেখ] এবারে তোমার ঘরে একটি বৈদ্যুতিক ঘন্টা রেখে দাও। ঐ ঘন্টার একপ্রান্তের সঙ্গে তড়িৎদ্বারের যে কোন একপ্রান্তের সরাসরি যোগ করে দাও। এবার তড়িৎ-দ্বারের অপর প্রান্তের সঙ্গে 1-নং ধাতব পাতের সংযোগ ঘটিয়ে দাও। 2-নং ধাতব পাতের সঙ্গে বৈদ্যুতিক ঘন্টার সংযোগ সাধারণ অবস্থায় পাত দুটি একে অপরকে স্পর্শ করে না বলে তড়িৎবর্তনী ছিন্ন থাকে। পাত দুটির উচ্চতা খুবই কম হওয়ায় ডাকপিয়ন যখন একটা চিঠি দেবেন তখন সামান্য ওজনের প্রভাবেই একটি পাত অপর পাতকে স্পর্শ করবে অর্থাৎ তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হয়ে বৈদ্যুতিক ঘন্টা বেজে উঠবে আর তুমি শব্দ শুনেই ছুটে এসে তোমার চিঠিখানা নিয়ে যাবে। আর প্রতিদিন তোমাকে চিঠির বাক্স খুলে সময় নষ্ট করতে হবে না। লোড্‌শেডিং-এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নির্জল কোষ ব্যবহার করতে পার।

জেন্কিন্স স্কুল, কোচবিহার।

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী / লেখা ও ছবি : গৌতম কর্মকার

স্বচ্ছ কাচের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে অধ্যাপক দেখলেন- নটিলাসের নাবিকেরা জাহাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে সোনাদানা উদ্ধার করছে।
এতো ধনরত্নে আপনার কী প্রয়োজন ক্যাপ্টেন?
আপনি কি ভাবছেন নিজের ভোগবিলাসের জন্যে আমি এ সব সংগ্রহ করি?
এগুলো ভালো কাজে লাগাই না তাই বা আপনি ভাবলেন কী করে! এই পৃথিবীতে যে অসংখ্য অসহায় উৎপীড়িত মানুষ আছে তাদের আমি জানি না?
অদ্ভুত এই মানুষটিকে কি আমি আঘাত দিলাম? অসহায় মানবজাতির জন্যে কী গভীর ভালোবাসা! এবার বুঝতে পারছি ক্রীট দ্বীপের কাছে নিকোলাস পেস্কার হাত দিয়ে এই রকম মানুষদের জন্যেই সাহায্য পাঠিয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন।
পরের দিনের কথা-
চলুন অধ্যাপক, আপনাকে নতুন কিছু দেখাবো।
সানন্দে ক্যাপ্টেন!
ডুবুরির পোষাক পরে নিমোর পিছু পিছু অ্যারোনেক্স উপস্থিত হলেন সমুদ্রের তলদেশে।
পরিবেশ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে...
আমরা কোথায় চলেছি?

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা
ধীরেন বল
পরিবেশ দূষণের ভয়ে তুই তবে ডাঁটা তুলতে বারণ করছিস?
না মা! ভাল করে চচ্চড়ি রাঁধো তো, মজা করে খাওয়া যাবে।
শুধু ডাঁটা কেন, গাছপালা সবাই পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে।
বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড এদের খাদ্য।
ওরা বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। অক্সিজেন বিনা জীবজগৎ বাঁচতে পারে না।
গাছরা যেটা চায় না আমরা সেটা চাই। ওরা যা চায় সেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক।
তাই নিজেদের স্বার্থেই উদ্ভিদকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।
ওরা বাঁচলে আমরা বাঁচবো।
পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে প্রত্যেকের কিছু কিছু গাছ লাগানো উচিত।
আর অনর্থক সে গাছ ধ্বংস করা অপরাধ।
ওই দেখ কীভাবে আমরা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষিত করি।
অথচ ডাস্টবিন একটা রয়েছেই —

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে। সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান, কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও তো নানা রকমের। কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে। আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে। লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়। কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান—যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই সমস্ত চিঠি খুলে পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন ঃ

এক ঃ কি ধরনের লেখা ঃ ছড়া গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি

দুই ঃ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা ঃ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর, নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।

তিন ঃ সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।

চার ঃ আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।

আশা করি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। —সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JAN-BIJNAN 3rd year, August 1983 Regd No WBCC/50

ছোটদের জন্য বই একশ বই

কিশোর ক্ল্যাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ভেপান্তর—২০·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কিশোর অপু—২০·০০
অপুর ছেলেবেলা—১০·০০
ছোটদের অপরাজিত—১০·০০
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের কাজল—১০·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা—৮·০০
বুদ্ধদেব বসু ॥ অপরূপ রূপকথা—১০·০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ বাংলার ডাকাত ১-৪—৩২·০০
মহিষ ডাকাত—১০·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ঘনাদা বিচিত্রা—২০·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ টেনিদার অভিযান—২০·০০

ভ্রমণ ও অভিযান

ধীরেন্দ্রলাল ধর ॥ দুরন্ত যাত্রী—৮·০০
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা—৮·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ৮·০০
আমাজনের অরণ্যে—৮·০০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নীল তিমি—৮·০০
শিশির ঘোষ ॥ লাহুলসিংহের সন্ধানে—৬·০০

রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্র কুমার রায় ॥ ভৌতিক গল্প—১০·০০
মোহনপুরের শ্মশান-৫·০০ যক্ষপতির রত্নপুরী ৬·০০
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল ॥
কিশোর রহস্য গল্প—৮·০০
কিশোর রোমাঞ্চ গল্প—৮·০০
কিশোর গোয়েন্দা গল্প—১০·০০
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ যখের আসন—৮·০০
আনন্দ বাগচী ॥ মুখোশের মুখ—৮·০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ খুকুমণির ছড়া—১০·০০
অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ হট্টমালার দেশে—৫·০০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায় ॥ সংখ্যা নিয়ে খেলা—৮·০০
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা—৫·০০
সায়েন্স ক্যুইজ—১০·০০
সমরজিৎ কর ॥ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী—১৫·০০
সমুদ্রের সম্পদ—৮·০০
স্বপন বুড়ো ॥ বুক অব নলেজ—১০·০০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ রোবোট এল কেমন করে ?
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার—৬·০০
সিদ্ধার্থ ঘোষ ॥
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা—১০·০০
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ৬·০০

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ পশুপাখী কীটপতঙ্গ—৮·০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ পশুপক্ষী—২০·০০
বনে জঙ্গলে ২০·০০
অজয় হোম ॥ বাংলার পাখি—২০·০০
অমিতাভ চক্রবর্তী ॥ ছোটদের বাঘের গল্প—৮·০০
কেনেথ আণ্ডারসন ॥ বাঘের গর্জন—১৫·০০
মানুষখেকোর বিভীষিকা—১৫·০০

ফ্যাণ্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা—৮·০০
ঘনাদার জুড়ি নেই—৮·০০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ চারমূর্তি—৮·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য—৮·০০ কম্বল নিরুদ্দেশ—৬·৫০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ হাতিচোর—৮·০০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮·০০
রামধনু ১০·০০ ছোটদের মজার গল্প—৬·০০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্প-বিজ্ঞানের গল্প—১৫·০০
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন—৮·০০
তুষারলোকের রহস্য—৮·০০ মেঘনাদ—১০·০০
অদ্রীশ বর্দ্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান—১৫·০০

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেস ১৯ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬